ছুটিতে ছোটাছুটি

আশাপূর্ণা দেবী

সময়কাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল : ১৯৬২
বৈশাখ : ১৩৬৯

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ও অলংকরন :
জয়ন্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :
সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

কলেজে ছুটি হলেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়া অধ্যাপক জগবন্ধু বোসের এক নেশা। আর অধ্যাপক-মানুষদের তো ছুটি লেগেই আছে। পূজোর আর গ্রীষ্মের লম্বা লম্বা ছুটি বাদেও, ছোটখাটোও তো কত।

অতএব লম্বা ছুটিতে দূরপাল্লায়, আর ছোটখাটোতে কাছেপিঠে। ছুটির একটা বেলাও নষ্ট করেন না জগবন্ধু। আগে থেকেই একটা হালকা স্যুটকেসের মধ্যে দরকার মতো জামা পোশাক আর সাবান তোয়ালে শেভিং-সেট টুথব্রাশ গুছিয়ে রাখেন। আরও একটা বাড়তি জিনিস থাকে, একটা হাওয়া বালিশ। যেটা চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে ওই স্যুটকেসের মধ্যেই পড়ে থাকে। দরকারের সময় গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে গোলগাল করে নেওয়া যায়। ব্যস! আর কী চাই? স্ত্রী পুত্র তো নেই যে সঙ্গে যাব বলে বায়না ধরে মোটঘাট বাড়াবে? না না, মরে-টরে কেউ নেই হয়ে যায়নি। জগবন্ধু বিয়েই করেননি, তাই।

কিন্তু এখন একটা মুশকিল হয়েছে, জগবন্ধু বোসের বেড়াতে যাবার মতো জায়গা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম সব দিকগুলোই প্রায় কাবার করে ফেলেছেন। গ্রীষ্মে পাহাড়-চুড়োর দেশগুলোয়, আর পূজোয় সমতলে, সমুদ্রকূলে, এখানে-সেখানে। সহকর্মী বন্ধুরা বলেন, এবার আপনি ভারতের বাইরে পা বাড়ান জগবন্ধুবাবু, এখানের তো আর বাকি রাখলেন না কিছু।

তা সে সাধ কি আর নেই? তবে সাধ্য কোথায়? তাই হেসে-হেসে বলেন, যাব, স্টেট লটারির ফার্স্ট প্রাইজটা পেলেই চলে যাব। তা এখনো তো সেটা পাওয়া যায়নি। কাজেই চিন্তা, এদেশেই কোথায় যাওয়া যায়। ওনার আবার এই অভিমত, একমাত্তর মামার-বাড়ি ছাড়া, কোন ভাললাগা জায়গায় দুবার যেতে নেই। তাতে

নাকি প্রথমবারের ভাললাগার সুখস্মৃতির বারোটা বেজে যায়। দ্বিতীয়বারে অপূর্বঅপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর ভূমিগুলোও নাকি জোলো আর পানসে হয়ে যায়। এখন তাই ভারী মন খারাপ লাগছে, ইস, কেন যে সব ভাল জায়গাগুলো দেখে শেষ করে ফেলেছি! ভবিষ্যতের জন্যে রাখিনি!

কিন্তু সামনেই তেত্রিশ দিন ছুটি! যেতে তো হবেই কোথাও। বাড়ি বসে থাকতে তো পারেন না।

সাধন অবশ্য প্রতিবারের মতো মনিবকে এবারেও বলছে, কলকেতার পুজোটা একবার দেখুন না দাদাবাবু! কত জৌলুস, কত বাজনা-বাদ্দি। দিকে দিকে কত ফাংশন! সব ছেড়েছুড়ে কেবল ইস্টিশানের দিকে ছুট মারা কেন?

সাধন জগবন্ধুর বাবার আমলের লোক, তাই দাদাবাবু বলে। বয়েসেও কাছাকাছি। জগবন্ধু বোসও পঞ্চাশ পার করেছেন, সাধন সামন্তও পঞ্চাশ পার করেছে, তবে হয়তো কিছু আগে-পিছে। তা সাধন জগবন্ধুর শুধু কমবাইনড হ্যানডই নয়, একাধারে চাপরাশি বেয়ারা দারোয়ান এবং গার্জেন। অবস্থাকালে শাসন করতেও ছাড়ে না। তবে এই ছুটিতে ছুটোছুটিটা আটকাতে পারে না কিছুতেই। ছুটি আসছে, অমনি জগবন্ধু বোস ভারতবর্ষের ম্যাপ আর টাইম টেবল খুলে বসেন। এবারেও বসেছেন। বিকেলবেলা। টাইম টেবলের পাতা উল্টোচ্ছেন জগবন্ধু নিজের দোতলার ঘরের লেখাপড়ার টেবিলে, হঠাৎ মনে হল ঘরের লেখাপড়ার টেবিলে, পাশে রাস্তার দিকের বারান্দায় কে যেন একটু ছায়া ফেলে একপাশে সরে গেল। এটা কী করে হবে? ওখানে যেতে হলে তো এই ঘর দিয়েই যেতে হবে? জগবন্ধু বোসের সামনে দিয়ে। আর যেতে পারে তো একমাত্তর সাধনই। আর কে আছে বাড়িতে? কিন্তু সাধনটি তো নেহাত চড়াইপক্ষীটি নয়, আড়ে-দীর্ঘে প্রকাণ্ড একটা আস্ত মানুষ! জগবন্ধু কি এমনই অন্যমনস্ক হবেন যে, সাধন তাঁর সামনে দিয়ে ঘর পার হয়ে চলে গেল আর তিনি দেখতে পেলেন না?

নাঃ! ছায়াটা বোধহয় মায়া। তবু বললেন, কে! কে ওখানে?

সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলেন, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, দৃষ্টিভ্রম নয়, স্রেফ জলজ্যান্ত মানুষই। একটা নয়, একজোড়া। যদিও একজোড়া ফুলদানি বা একজোড়া জুতোর মতো সাদৃশ্য নেই। একজন ফর্সা, মাথায় খাটো, একটু নধর-নধর। আর একজন ময়লা, ঢ্যাঙা শুঁটকো-শুকনো। তবে বয়েসে বোধহয় সাদৃশ্য আছে। আর সাদৃশ্য দেখা গেল আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে। দুজনে দু'গাল হেসে টুক করে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল, আজ্ঞে. স্যার আমরা।

আমরা মানে? আমরা মানে কে? জগবন্ধু চেয়ার ছেড়ে বারান্দার দরজার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আমি জানতে চাই, 'আমরা. কথাটার অর্থ কী?

ওদের হাসিটা কিঞ্চিৎ ফিকে হল, তবু রইল। একজন বলল, আজ্ঞে আমি আর ও। একজনের বেশি হলেই তো 'রা' হয় স্যার।

বটে। বাঃ! ব্যাকরণজ্ঞান তো দিব্যি টনটনে দেখছি। বলি কে তোমরা? নাম কী?

আজ্ঞে ইয়ে, বেঁটে জন নীচু গলায় ঢ্যাঙাকে বলল, এই, আমাদের যে পোশাকি নাম দুটো ঠিক হয়েছিল, সে দুটো কী রে?

ঢ্যাঙা তেমনি ফিসফিসে গলায় বলল, আমারটা তো শ্রীমদনমোহন পাল। তোরটা তোর মনে নেই?

মনে থাকলে আর শুধোচ্ছি কেন? আমার তো আর তোর মতন স্মৃতিশক্তি নেই।

তোরটা—তোরটা বোধহয় ট্যাঁপাচরণ দাস।

ধুত! আমারটাই তো পাল, তোরটা দাস।

ঢ্যাঙা বলল, তা হবে, ওই একই কথা।

জগবন্ধু বোস এতক্ষণে কড়া চোখে ওদের আপাদমস্তক দেখছিলেন, এখন ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, কী ফিসফিস হচ্ছে শুনি?

ঢ্যাঙা মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে—আপনি তো নাম শুধোলেন, তো পোশাকি নাম দুটো অনেক দিন ব্যাভার হয়নি, তোলা ছিল।

কোন্‌টা কার গুলিয়ে যাচ্ছে। যাক্‌গে, ওতে কিছু না। জামা জুতো তো নয় যে একজনেরটা আর একজনের গায়ে পায়ে বসবে না। ওর নাম ধরুন শ্রীট্যাঁপাচরণ পাল, আর আমারটা ধরুন গিয়ে শ্রীমদনমোহন দাস।

জগবন্ধু চড়া গলায় বলে উঠলেন, বাঃ! বাঃ! তোমাদের নামটা আমায় ধরতে হবে? চালাকি নাকি? বলি, এই বারান্দায় উঠে এলে কী করে?

ঢ্যাঙা আবার একগাল হেসে উত্তর দিল, আজ্ঞে, খুব সহজে। বারান্দার নীচে রোয়াকের ওপরকার লোহার খুঁটিগুলো বেয়ে। বেশ পেলেন-মতো গোল খুঁটিগুলো তো, আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি। তরতরিয়ে উঠে এইছি।

কোন কষ্ট হয়নি? বাঃ! বাঃ! তাহলে তো আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। তা এই আসাটাই বেশ সহজ মনে হল, কেমন? বাড়িতে ঢোকবার জন্যে একটা দরজা থাকে, জানো?

আজ্ঞে জানি বৈকি?

তবে?

তো দরজায় একটা বাঘা কুকুর বসিয়ে রাখলে, এছাড়া উপায় কী স্যার?

জগবন্ধু কড়া গলায় ভেঙিয়ে বলেন, না রেখেই বা উপায় কী স্যার? ওঃ, তোমরা তো আবার দু'জন? তো, তোমাদের মতো চোর-ছ্যাচোড়ের ভয়েই কুকুর রাখতে হয় স্যারদের।

চোর-ছ্যাচোড়! ঢ্যাঙা দুঃখু-দুঃখু গলায় বলল, এই কঠিন কথাটা আমাদের বললেন স্যার? অথোচ মাত্তর একটা বছর আগেই আমরা দুজন চোর ধরে দিয়ে পুরস্কার পেয়েছি। শুধু চোর বললে কিছুই বলা হয় না। চোর-জোচ্চোর-চোরাকারবারি, আরো কত কী।... তখন খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে আমাদের, গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে। পাঁচটা কেলাব থেকে আমাদের ডেকে-ডেকে 'সংবর্ধোনা' না কী যেন দিয়েছে। এটা-সেটা উপহার দিয়েছে। মানপত্তর

দিয়েছে। তখনই ওই পোশাকি নাম দুটো বানিয়ে নিতে হয়েছিল স্যার। আর আজ কিনা····

সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটেও বলে উঠল, আর আজ কিনা····

তারপর দুজন একসঙ্গে বলে উঠল, হতভাগাদের ভাগ্যে এই রকমই হয় স্যার। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ক'বার ছিঁড়বে? সবই হুজুগ! সেদিনকে যে সব কেলাবের ছেলেরা ডেকে-ডেকে মানপত্তর দিয়েছে, এখন আর তারা আমাদের দেখলে চিনতে পারে না। তবে গত বছরের খবরের কাগজ এনে দেখাতে পারি স্যার। প্রাণ-তুল্যি করে তুলে রেখেছি 'ইষ্টকবিজয়ী দুই বীর' বলে ছবি ছাপা।

কী বিজয়ী?

আজ্ঞে ইষ্টকবিজয়ী।

জগবন্ধুর ভুরুজোড়া কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। বললেন, তার মানে?

সে অনেক হিস্টিরি স্যার, দিন পাই তো বলব। তা সে-সব দিন আর কে মনে রেখেছে বলুন? এখন অবস্থা সেই 'পুনোরমূষিক' না কি বলে, তাই আর কী!

প্রফেসর বোস ভাবছিলেন, সাধনকে ডেকে ছোঁড়া দুটোকে একবার কান ধরে ওঠবোস করাবেন। খুঁটি বেয়ে দোতলায় ওঠা তো চোরাই পদ্ধতি। কিন্তু খবরের কাগজে ছবি, সংবর্ধনা, মানপত্তর—এ সব শুনে একটু যেন থতমত খেলেন। কে জানে সবটাই স্রেফ গুল না কিছুটা সত্যি আছে। এসব আবার কী ধরনের গুল।

তবু ব্যঙ্গের গলায় বললেন জগবন্ধু, তো সেই ছবিটা পকেটে নিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল বাপু তোমাদের। দেখা যেত, গলায় ফুলের মালা, না ঘুঁটের মালা।

ঢ্যাঙা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, বলে নিন স্যার। এ হতভাগারা হ্যানস্তা খেতেই জন্মেছে। তো কষ্ট করে আর 'তুমি' করে কথা বলছেন কেন, তুই-তোকারি করুন। ব্যাটা বদমাস বলুন, চোর গুণ্ডা বলুন।

ও বাব্বা, এ যে আবার মানে খান খান। জগবন্ধু প্রায় হেসেই ফেলেছিলেন, ঠিক এই সময় দীর্ঘদেহী সাধন সামন্ত চায়ের ট্রে নিয়ে দুমদাম করে ঘরে ঢুকল। আর ট্রেটা টেবিলে নামাবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, এই মস্তান দুটো, তোরা আবার কোথা থেকে এসে জুটলি? বেরো, বেরিয়ে যা বলছি। এমনভাবে চেঁচাল যেন ভাতের থালার কাছে কাক এসেছে না বেড়াল থাবা তুলেছে।

সাধনের আচরণটা মোটেই পছন্দ হল না প্রফেসর জগবন্ধু বোসের। এ আবার কী! না-হয় একটু উল্টোপাল্টা ধরনে দোতলায় উঠে এসেছে: তা বলে এভাবে দূরছাই করতে হবে! মানুষ তো! না কী? রোসো বাছাধন সাধন। তোমাকেই প্যাচে ফেলছি। বললেন, তা তুই তো সদর দরজা পাহারা দিচ্ছিলি, কোথা থেকে জুটল তুই জানিস না?

সাধন রেগে বলে ওঠে, আমি একা নয়, বাঘাও পাহারায় ছিল। একটা মাছিও প্রবেশ করতে পারবে না।

জগবন্ধু হাসি চেপে বললেন, মাছি প্রবেশ করতে না পারুক জলজ্যান্ত দুটো মানুষ তো প্রবেশ করে এসেছে দেখছিস।

দরজা দিয়ে কক্ষনো না। স্ট্যাম্পো কাগজে লিখে দিতে পারি।

তা না হয় পারলি। তো কোনখান দিয়ে তো ঢুকে এসেছে। একে কি পাহারা বলে?

সাধন জোর গলায় বলে, রাবণরাজার মতন কুড়িটা চোখ আছে আমার? তাই দশ দিকে চোখ ফেলে বসে থাকব? এই পাজিরা, কোথা দিয়ে দোতলায় উঠে এলি তোরা? পাইপ বেয়ে? না মই বেয়ে?

দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে ঢ্যাঙাই মুখপাত্র। সেই এগিয়ে এসে জোর গলায় বলে উঠল, পাজি-টাজি বলবে না বলছি।

না, পাজি বলবে না, মানিকচাঁদ বলব! কী মতলবে উঠে এসেছিস শুনি?

তোমাকে বলতে যাব কেন? তুমি কি স্যারের সঙ্গে দেখা করিয়ে

দিলে ? কতদিন ধরে তো খোশামোদ করছি।

জগবন্ধু তো অবাক—এদের তুই চিনিস ?

সাধন এতক্ষণে হাতের ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে চা ছাঁকতে-ছাঁকতে বলল, রোজ এসে ঘ্যানঘ্যান করলে না চিনে উপায় ?

এখন বেঁটে বলে ওঠে, আপনার এই লোকের স্যার কথাবার্তা সুবিধের নয়। আপনার সঙ্গে একটু বাক্য কইতে চাই শুনে কী জেরা। আমরা যেন কাঠগড়ার আসামী। কী মতলবে, কী অবিসন্ধি, বাবু কি পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যায় নাকি, এবার কোথায় যাবে, এ-সব তোর জানবার দরকারটা কী। এইসব।

জগবন্ধু আরো অবাক হলেন। তো সত্যিই তো কী দরকার ?

বেঁটে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঢ্যাঙা বলল, তুমি থাম, আমিই বলছি। কিন্তু সে একটা গোপনীয় কথা স্যার। আপনার ওই লোকের সামনে বলব না। ওকে একটু সরে যেতে বলুন।

বটে বটে! সাধন হাতের চামচখানাই ছুরির মতো উঁচিয়ে ধরে বলে ওঠে, আমি সরে যাই, আর তোরা স্যারের পেটে ছুরি বসিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে ভেগে যাস, কেমন ?

জগবন্ধু বললেন, আঃ সাধন! কী ছেলেমানুষি করছিস ? ছাখ-না এরা কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কী হে বাপু, কলেজে ভর্তি হতে চাও নাকি ?

লম্বা-বেঁটে তু'জনেই মাথা নিচু করে। ঢ্যাঙা বলে, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোবে না। শুধু একটা বাসনা ব্যক্ত করতে চাই।

জগবন্ধু চায়ের কাপটা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে রেখে সাধনের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা-লজ্জা হেসে বলেন, ছেলে ছুটোর সামনে আমি একা চা খাব সাধন ? মানে—

আর মানে বোঝাতে হবে না, সাধন চড়া গলায় বলে, সাধন অনেক আগেই বুঝে ফেলেছে। কিন্তু বলে রাখছি, ফুলকাটা কাপ প্লেটে দেব-টেব না। চটা-ওঠা কলাইকরা গেলাসে ধরে দেব, ব্যস!

আহা তাই দিস বাপু! তবে তার সঙ্গে আর-কিছুও দিস। দেখে মনে হচ্ছে খিদে পেয়েছে। ঘরে নেই কিছু?

সাধন কাঁধের ঝাড়নটা দিয়ে জোরে-জোরে ঘাড় মুছতে-মুছতে বলে, থাকবে না কেন? সবই আছে। বিস্কুট পাঁউরুটি কলা আপেল সন্দেশ ডিম রাতের জন্যে রেঁধে রাখা মাংস—

থাক থাক, অতয় দরকার নেই, ওই গোড়ায় যা-যা বললি, তাই নিয়ে আসিস কিছু।

ঠিক আছে। নিয়ে আসছি। ঘরে কুটুম এসেছে যখন। সাধন ভুমদাম করে চলে যেতে যেতে বলে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন, রাতের কুটুম।

জগবন্ধু বোস এবার চায়ের কাপটা মুখে তুলে বললেন, এইবার বলো তো বাপু, কী তোমাদের গোপন বাসনা ব্যক্ত করতে চাও?

ভাবলেন, টাকাকড়ি চাইবে কিছু।

কিন্তু এ আবার কী বাসনা?

শুনে হো-হো করে হেসেই উঠলেন জগবন্ধু।

খিদমদগার? তা-ও একটা নয়, দু-দুটো? না, বাপু, বেড়াতে আমি একাই যাই। খিদমদগার-টার দরকার হয় না।

ওরা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে, দরকার তো আপনার নয় স্যার, দরকার আমাদের। ওই পানের দোকানের নবকেষ্ট বলে, আপনি বছর-বছর সুটকেস ঝুলিয়ে বেড়াতে যান, ওই নাকি নেশা আপনার। শুনে বুকের মধ্যে যেন হাঁচোট-পাঁচোট করে। জন্মজীবনে কখনো একবার রেলগাড়ি চড়লাম না—

অ্যাঁ! সে কী! জগবন্ধু যেন আছাড় খান, জন্মে কখনো রেলগাড়ি চড়োনি? আহা-হা! ইস!

।। দুই ।।

ওরা চলে যাবার পর, আছাড় খেল সাধনও। প্রায় আকাশ থেকেই খেল। অ্যাঁ! ওই বিচ্ছু দুটোর ভাঁওতায় ভুলে প্রমিস করে বসলেন? ওই দুটোকে ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতে যাবেন এবার?

জগবন্ধু বললেন, আহা! ঘাড়ে করে আবার কী। দুখানা বাড়তি টিকিট কেনা, এই তো। আহা, আহা, জন্মজীবনে কখনো রেলগাড়ি চড়েনি?

সাধন গম্ভীর হয়ে বলল, ও। তা খাওয়াদাওয়ার খরচ ওরা নিজেরাই দেবে বলেছে?

নিজেরাই দেবে? তুই যে হাসালি সাধন। দেবে কোথা থেকে শুনি? পকেটে কিছু থাকলে এভাবে হাতে-পায়ে পড়তে আসত?

সাধন রেগে-রেগে বলে, কপালে আপনার অনেক দুঃখু আছে দাদাবাবু, দিব্যচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ঘুঘু দুটোর কবলে পড়ে অকূলে ভাসতে চললেন। তো কিছু টাকা সাহায্য করলেই হত। সঙ্গে নেওয়ার দরকার কী ছিল? চিরটাকাল ঝাড়া হাত-পায়ে ঘুরেছেন বেড়িয়েছেন।

জগবন্ধু এখনও একটু লজ্জা-লজ্জা হেসে বললেন, সেটাও ভেবেছিলাম। তবে কী জানিস? আমারও তো জন্মজীবনে কেউ 'সঙ্গে যাব' বলে বায়না করেনি।

হুঁ, সাধন আরো গম্ভীর হয়ে বলে, বায়না করবে তো আপনার বাড়িঘর পাহারা দেবে কে? পোষা বাঘের সেবা করবে কে?

আহা সে কথা হচ্ছে না। তুই আমারই মতো একটা বুড়োধাড়ি। এরা দুটো বাচ্ছা ছেলে—

বাচ্ছা কি আচ্ছা টের পাবেন এরপর। তা যাওয়াটা হচ্ছে কোথায়?

আর বলিস না। দুটোতেই একেবারে রাঁচি যাবে বলে ঝুলে পড়ল।

রাঁচি! সেখানে তো আপনার যাওয়া হয়ে গেছে!

গেছে তো, জগবন্ধু জোরে-জোরে বলে ওঠেন, কী করব! ওই নাকি ওদের জীবনের বাসনা।

বুঝেছি! রাঁচিতে কেউ আছে তা হলে। আপনাকে ভোগা দিয়ে দিব্যি বিনি পয়সায় —

আরে না না। শুনেছে যে রাঁচিতে পাগলা গারদ আছে। সেই নাকি বাসনা। জন্মজীবনে একবার পাগলা-খানা দেখবে। একসঙ্গে অনেক পাগল। দারুণ ঝোঁক!

চমৎকার!

সাধন ধিক্কারের গলায় বলে, শেষ অবধি আপনাকেই না পাগল বানিয়ে গারদের দরজায় ছেড়ে দিয়ে আসে।

জগবন্ধু রেগে বললেন, এই তোর একটা রোগ সাধন, মানুষকে বড় সন্দেহ করিস।

সাধনও ছেড়ে কথা কয় না, পালটা জবাব দেয়, তা অজানা অচেনা উটকো লোককে বিশ্বাস করে পস্তানোর থেকে আমার রোগও ভাল।

বলে দুমদুম করে নীচে নেমে যায় সাধন। অনেক কিছুই তো এখন গোছাতে হবে তাকে। এ তো আর দাদাবাবুর অন্যবারের মতো হালকা হয়ে যাওয়া নয়, পানসির পিছনে দু-খানা গাধাবোট যাবে। নির্ঘাত দাদাবাবু যাত্রাকালে বলে বসবেন, সাধন, এদের তো অমুকটা চাই, সাধন, এদের তো তমুকটা দরকার, সাধন, ওদের তো দেখছি কিছুই নেই, বিদেশ-বিভুঁই যাচ্ছে, কষ্টে না পড়ে।

যাবার খবর শুনে ওদের দুজনের বাড়িতে একজনের ঠাকুমা আর একজনের সৎমা বলে উঠল, নিজের পয়সায় তোদের রেলের টিকিট কিনে দিয়ে বেড়াতে নে যাবে, আবার জামা জুতো চাদর সুয়েটার

দিচ্চে, সুটকেস কিনে রেকেচে? এ কি মামদোবাজি? খবরদার ওমুখো হসনে বলে দিচ্ছি, বেপদে পড়বি। বুজতে পারচিসনে কোনো সব্বনেশে ছেলেধরার খপ্‌পোরে পড়েছিস। বাড়ির মদ্যে সুইকে থাক কিছুদিন।

কিন্তু তাই কখনো কেউ থাকে? এমন সুযোগ পেয়ে? একসঙ্গে অনেক পাগল দেখবার সাধ বলে তো আর নিজেরা পাগল নয়?

সাধন অবশ্য ধরে নিয়েছে ওই ঘোড়েল ছেলে দুটো কোনো কলকৌশল করে তার দাদাবাবুকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। নইলে এ-রকম সম্ভব? কেউ কখনো দেখেছে না শুনেছে, রাতারাতি দুটো ছেলের এমন রূপান্তর ঘটেছে! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে নাকি ওরা?

॥ তিন ॥

রাঁচির মাটিতে পা দিল যখন ওরা, ট্যাঁপা আর মদনা, রীতিমত দুটি জেণ্টেলম্যান! স্বয়ং জগবন্ধুর থেকেও অনেক চকচকে ঝকঝকে।

জগবন্ধুর তো ধুতি চটি, আর মাথাজোড়া টাক! আর ওদের? চুলের বাহারটা নিজেদেরই ছিল, সব ছেলেরই কিছু না থাক, চুলের বাহার থাকে। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন শার্ট, নতুন প্যাণ্ট, নতুন জুতো, আর চোখ-ঝলসানো রঙের এক-একটি সোয়েটার। তা সোয়েটার লাগবে বৈকি। পুজো এবার অক্টোবরের শেষ ঘেঁষে, নভেম্বর পড়ল বলে। আর রাঁচি ঠাণ্ডা জায়গা। জগবন্ধুর তবু শালটাল আছে, ওদের তো কিছুই না। এই রংপছন্দটা অবশ্য সাধনের। সেই তো কিনে এনেছে। আর বলেছে, খুব সুসময় খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠেছিল বটে। একেবারে ওপরতলার লোক হয়ে গেলি।...সত্যি, জগবন্ধুর সঙ্গে এক কামরায় এসেছে, এক কৌটোর খাবার খেয়েছে, একই সঙ্গে নাক ডাকিয়েছে।

ওরা প্রথমে তো ভয়েই কাঠ, আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে স্যার ? আমাদের তো থার্ড কেলাশে তুলে দিলেই হত।

জগবন্ধু ধমকে উঠেছিলেন, আলাদা গাড়িতে তুলে দিই, আর তোমরা ভুল করে যেখানে-সেখানে নেমে পড়। তা ছাড়া—থার্ড কেলাশ বলে এখন আর কিছু নেই বাপু।

নেই ?

না। আর শোনো, ফি-কথায় অমন স্যার-স্যার করো কেন ? আমার খুব খারাপ লাগে।

তবে কী বলব স্যার ?

তাও বটে। জগবন্ধু এখন চিন্তায় পড়লেন। সত্যি কী বলবে ?

জগবন্ধুবাবু ?

ধ্যেত !

বোস মশাই ?

দূর ! অথচ ছুটিতেও স্যার-স্যার শুনতে বেজার লাগছে।

তবে ? তাহলে ?

ঠিক আছে। হেঁকে বললেন, মামা কাকা বা জ্যাঠাবাবু যা হোক বলবে।

আপনাকে ? আমরা ? আমরা এই ছোটলোক—

এই খবরদার ? ছোটলোক শব্দটা ব্যবহার করবে না। কোনো সময় নয়। নিজের বা পরের কারুর সম্পর্কেই নয়। বুঝতে পেরেছ ?

পেরেছি আজ্ঞে।

আর মনে রেখো সার্ভেন্ট কথাও মুখে আনবে না। কেউ যদি তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে, বলে বোসো না যেন, স্যারের সার্ভেন্ট। বুঝেছ ?

বুঝেছি।

ট্যাঁপা ভয়ে-ভয়ে বলে, তা সেক্ষেত্রে কী বলব ?

বলবে ? কী বলবে ? ইয়ে-ইয়ে—হ্যাঁ—বলবে নেফিউ।

নে-ফি-উ। মানে কী স্যা-ইয়ে-মা-মা-মামাবাবু ?

কী মুশকিল। তা-ও জানো না? মানে হচ্ছে ভাইপো ভাগ্নে বা ওই রকম সব।

দু রকমই হতে পারে? জিজ্ঞেস করল মদনা।

পারে। তিন-চার রকমও হতে পারে।

আমি তা হলে স্যা-ইয়ে জ্যাঠাবাবু বলব। বেশ গালভরা প্রাণভরা ডাক। তো আপনাকেও কিন্তু তা'লে আমাদের একটা কথা শুনতে হবে।

তাই নাকি? শুনি কী কথা?

আমাদের তুই তুই করে কথা কইবেন। তুমি কইলে বুকের মধ্যে যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠ্যাকে। মনে নেয়, আর কাউকে বলছেন।

হা-হা-হা। ঠিক আছে।

ক' বছর আগে যখন রাঁচি এসেছিলেন জগবন্ধু বোস, তখন বেশ সুন্দর ছোটখাটো আর নির্জন-নির্জন একটি হোটেলে উঠেছিলেন। মোরাবাদি পাহাড়ে যাবার পথের ধারে, নাম 'দি হোটেল বিউটি'। তা সত্যিই বিউটি। চারিদিকে বাগান, সামনে মোরাম বিছোনো রাস্তা।

এবারেও সেখানেই উঠবেন ঠিক করে রিকশাওলাকে বলে দিলেন। দুটো রিকশা ভাড়া করে চলেও এলেন তিনজনে বেশ তরতরিয়ে। কিন্তু হোটেলের বর্তমান চেহারা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল জগবন্ধু বোসের। এ কী! কোথায় সেই শান্ত নির্জন ছায়া-ছায়া মূর্তিটি! এ যে একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ!

সেই বাগান-ঘেরা বাংলো প্যাটার্নের ছোট বাড়িখানি চারিদিকে ঘরটর বাড়িয়ে একেবারে বিশাল হয়ে বসে আছে। দারুণ জমাটি ব্যাপার। লোকজন ছুটোছুটি করছে, আসছে যাচ্ছে। বেশ কয়েক জন বোধহয় একটু আগে এসে নেমেছে, হোটেলের বয় তাদের মালমোট তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাঁদের দিকে যেন তাকিয়েও দেখল না।

এটাই অবশ্য এদের চাল, বহু জায়গা ঘুরে-ঘুরে এ অভিজ্ঞতা আছে জগবন্ধু বোসের। বকশিশ পাবার আগে চিনতে পারে না। কিন্তু

এখানের ছবিটি মনের মধ্যে গাঁথা ছিল অন্য রকম। এই জন্যেই আমি এক জায়গায় দু'বার আসা লাইক করি না। মনে মনে বললেন জগবন্ধু, এত পরিবর্তন!

প্রথমটা তো ওঁর সন্দেহই হয়েছিল এটা আদৌ সেই হোটেলটাই কিনা। যদিও আশপাশের দৃশ্য কিছু-কিছু আগের মতোই রয়েছে দেখছেন, তবু রিকশওলাদের জিজ্ঞেস করলেন একবার। ওরা জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাই 'বিউটি হোটেল'। তারা জানে না?

পরে অবশ্য লক্ষ করলেন জগবন্ধু, ঠিক মাঝখানের অংশটার ওপরে রঙের প্রলেপ পড়লেও, গড়নটা আগের মতোই আছে। সেই দরজার মাথায় উঁচুতে একটা কুলুঙ্গিমতো, তার মধ্যে কী যেন একটি ঠাকুরের মূর্তি। কী ঠাকুরের সেটা জগবন্ধু আগেও দেখেননি ঘাড় উঁচু করে, এখনো দেখলেন না। তবে সাইনবোর্ডটাও যে পুরনোই সেটা দেখলেন। তার মানে ওটা পয়মন্ত। তাই বদলানো হয়নি।

ওই সামনের ঘরটাই রিসেপশান রুম। সেখানে যিনি জমকালো আসবাবপত্রে সাজানো পরিবেশে কাউন্টারে বসে আছেন, তিনি অবশ্য অচেনা। গোল মুখ, ইয়া গোঁফ।

জগবন্ধু দেখলেন, আরো একজন ভদ্রলোক ঘর বুক করবেন বলে খাতায় লেখাচ্ছেন। তবে তিনি নিশ্চয় এখানে প্রায়ই আসেন। কারণ যিনি লিখে নিচ্ছেন তিনি বলে উঠলেন, আপনার আর এত লেখা-টেখার কী আছে ডাক্তার তালুকদার। তবে খুবই দুঃখের বিষয়, আপনার বারো নম্বর কামরাটি গতকালই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এক মারাঠী ভদ্রলোক এসে বুক করে ফেলেছেন। আপনি আসবেন জানলে আটকে রাখতাম। অবশ্য পাশেরটা খালি রয়েছে, একই পোজিশান।

পাশেরটা মানে? এগারো?

না, এ পাশে। তেরো নম্বরটা।

আঃ! আনলাকি থার্টিন? আর কোনো রুমই খালি নেই আপনার?

আছে বৈকি। কিন্তু সে তো এদিকে। নতুন ব্লকে। ইস্ট ফেসিং পাবেন না। যেটা আপনি চান। বিছানায় শুয়ে সানরাইজ দেখা।

ডাক্তার তালুকদার একটু গুম হয়ে থেকে বললেন, তা হোক, ওই নতুন ব্লকেই একটা ব্যবস্থা করে দিন, ওখানে অ্যাটাচড্ বাথ আছে তো? গরম জল পাওয়া যাবে তো?

আঃ, ছিঃ ছিঃ। এ আপনি কী বলছেন ডাক্তার তালুকদার? আমার এখানে ব্যবস্থার কোনো তফাত পাবেন না।—এই ফাগুয়া—

ইঙ্গিতমাত্র কোথা থেকে সেই ফাগুয়া এসে ভদ্রলোকের মালটাল বলতে একমাত্র স্যুটকেসটিই তুলে নিয়ে পাশের করিডোরের মধ্যে দিয়ে কোন দিকে যেন ঢুকে গেল। ডাক্তার তালুকদারও বেজার মুখে তার পিছু-পিছু এগিয়ে গেলেন।

তালুকদার!

জগবন্ধু বোসের মনে হল, পদবীটা বিশেষ কমন নয়। তবু যেন মনে হচ্ছে কোথায় খুব শুনেছেন। কিন্তু কবে। কখন?

এখন কাউণ্টারের ভদ্রলোক একবার জগবন্ধুর আগাগোড়া দেখে নিয়ে, তেরছা চোখে পিছনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা দু'রকম সাইজের ছেলে দুটোকে দেখলেন। তারপর ভারী গলায় বললেন, কী চাই?

বোঝা গেল চেনা আর অচেনা দু'রকম লোকের জন্যে গলা দিয়ে দু'রকম স্বর বার করেন তিনি।

জগবন্ধু একটু হেসে বললেন, কী আর? থাকবার জায়গা।

ক'দিন থাকবেন?

কিছুদিন তো থাকার ইচ্ছে রয়েছে।

কটা রুম লাগবে?

জগবন্ধু বললেন, দুটো। পাশাপাশি দুটো পেলেই ভাল হয়, তবে ওই তেরো নম্বর ঘরটা আমার চাই।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। জেরার গলায় বললেন, কেন?

একটু আগে শুনলাম বিছানায় শুয়ে সূর্যোদয় দেখা যায়। শুনে লোভ হল।

অ! উনি অবশ্য আনলাকি থার্টিন বলে—যাক, আপনার যখন প্রেজুডিস নেই—তবে পাশাপাশি দুটো ঘর পাওয়া যাবে না।

হ্যাঁ, সেও তো শুনলাম। পাশাপাশি পেলে ভাল হত।

বুঝছি! উপায় নেই।

বলেই ভদ্রলোক কী ভেবে একবার দরজার বাইরে তাকালেন। দেখলেন রিকশা দু'খানা বসে রয়েছে। তার মানে এই আগন্তুকরা ওদের এখনো ছাড়েনি। তার মানে 'হোটেল বিউটি'র খদ্দেররা হাতছাড়া হয়ে গেলেও যেতে পারে। যদিও এখন সীজন্, তবু রাঁচি শহরে এখন হোটেলের অভাব নেই।

ভদ্রলোক মুখের পাথুরে ভাবটা একটু আলগা করে বললেন, ঘরটা কুড়ি বাই চব্বিশ, পুরনো আমলের তো?—তখন বোকার মতো ঢাউস-ঢাউস ঘর বানানো হত। ইচ্ছে করলে একস্ট্রা একটা 'কট' আনিয়ে আপনার ছেলেদের নিয়ে থাকতে পারেন। এমনিতে তো ডবল বেড্।

আপনার ছেলেদের!

ট্যাঁপা আর মদনা আর 'নেই'।

ভাল-ভাল জুতোজামা পরিয়ে এনে তাদের এই সর্বনাশটি করলেন স্যার। আরে বাবা, সার্ভেন্ট বলতে দোষ হয়, হেল্পার না কী যেন বলে তাই বললেই তো হত! এখন উপায়!

তা উপায় জগবন্ধু বাতলালেন। হেসে বললেন, না, সে বোধহয় ওদের অসুবিধে হবে। ছেলেমানুষ, নিজেরা হৈ-চৈ করবে—

হৈ-চৈ! গুঁফো ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, হৈ-চৈ করবে? আমার এই বিউটি হোটেলে? আপনার ওই এত বড়-বড় ছেলেরা?

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বললেন, ঠিক তা-ও নয়। আমারই অসুবিধা হবে আর কি। ভোরবেলা জানালা খুলে সানরাইজ দেখব, ওদের

ঘুম-ফুম ভেঙে যাবে। তো কাছাকাছির মধ্যে আর ঘর নেই?

কাছাকাছির মধ্যে! ওই করিডোরটার শেষে নিউ ব্লকের কর্নারে একটা সিঙ্গিল রুম ঘর খালি রয়েছে—সেটাকেই কাছে বলা যায়।

সেটাই ব্যবস্থা করে দিন। কত ছোট? একসত্রা একটা খাট ধরবে না?

ধরবে। এই কিছুদিন আগেই এক পার্টি তিনজনে থেকে গেছেন। মা বাপ ছেলে!

জগবন্ধু বললেন, কী রে? তোদের একা ভয় করবে না তো? করবে না? ভাল ভাল!

গুঁফো এবার রেজিস্টার-বুকটা মেলে ধরলেন, তার সঙ্গে ভাউচার বুক। আগে টাকা, তবে তো ঘর।

নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকেই ট্যাঁপা মেজেয় পাতা কার্পেটের ওপর বসে পড়ে বলে উঠল, মদনা--

খবরদার! মনে নেই—মোহন দাস!

ঠিক আছে! তাই তাই! মোহন! তুই—আমার গায়ে জোরসে একটা চিমটি কাট তো। মোক্ষম রামচিমটি!

এ আবার কী?

হ্যাঁ রে, দেখি, বেঁচে আছি কি না!

তা যা বলেছিস! এই ঘরে আমরা! সেই ট্যাঁপা আর মদনা। সুক্ষু কাঁচি নিয়ে লোকের পকেট সাফ করে বেড়িয়েছি।

সে কথা আর মনে পড়াসনে ম-মোহন। কে? কে?

বন্ধ দরজাটা ঠেলে একখানি মুখ উঁকি মারল। ওঃ সরি! রুম ভুল করে ফেলেছি—

সরে গেল মুখটা।

মদন বলল, ট্যাঁপা, চিনতে পারলি!

হুঁ! ডাক্তার তালুকদার না কি!...ভাবছি ভুল করে না মতলোব করে!

কেন? কিসের মতলোব? আমাদের দেখে কি মনে হচ্ছে,

অনেক টাকা আছে আমাদের ?

তা জানিনে, লোকটার চাউনিটা তেমন সুবিধের নয়।

ট্যাপা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আর একবার দরজাটা খুলে গেল। এবার অন্য কেউ নয়, স্বয়ং জগবন্ধু বোস। দেখতে এসেছেন কেমন ঘর পেয়েছে এরা।

এদের নিয়ে কেমন যেন একটা নতুন আনন্দের সুখ পাচ্ছেন জগবন্ধু। জীবনে তো কখনো বাইরে এসে কারুর জন্যে কিছু করতে হয়নি, নিজে ঘুরেছেন, নিজে বেড়িয়েছেন। অন্য কারুর জন্যে কিছু করতে পারা, সেটাও বেশ লাগছে। তাছাড়া—এ বেচারীরা যে নেহাতই দীনহীন তা তো বুঝতে পারছেন। অথচ এদের জীবনের বাসনা ভাল খাওয়া বা ভাল পরা নয়, বাসনা শুধু একটু বেড়ানো। আহা, সেইটুকু যদি জগবন্ধু বোসের সাহায্যে হয়!···ছেলে দুটোকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝেছেন, ছেলে দুটো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি বলেই মুখ্যু, কিন্তু বোকা নয় মোটেই। এবং অনেস্ট। জগবন্ধু বোসের বেশ মায়া পড়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে এদের একটু লেখাপড়া শেখাবেন।

তা সে তো পরে, এখন প্রায় ধমকানি।

আরে, এখনো বসে ? হাতমুখ ধুয়ে নে। ওই তো বাথরুম রয়েছে সামনেই। দ্যাখ, আমি দিব্যি ফ্রেশ হয়ে এলাম। চা খেয়েই তো বেরিয়ে পড়তে হবে।

এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে—এ-কথা ওরা ভাবেনি। কী অপূর্ব ঘর, জানালা দিয়ে কী সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, এখানে বসে থাকলেই তো বেড়ানো। তাই ধমক খেয়ে বলল, কোথায় ?

আরে বাবা, কোথায় নয় ? ঘরে বসে থাকবার জন্যে তো বেড়াতে আসা নয়।

এই ঘরটাই তো সগ্‌গে বেড়াতে আসা জ্যাঠাবাবু।

জগবন্ধু হেসে ওঠেন, ও বাবা, তুই যে আবার কবির মতো কথা বলছিস। তা বলে দ্রষ্টব্যগুলো তো আগে দেখে নিতে হবে। দেখি

বাস গুমটি কোথায়। কখন কোন্ কোন্ দিকে বাস ছাড়ে। যা একখানা জলপ্রপাত আছে না এখানে, মানে বিরাট ঝরনা আর-কি। বলে হুড্রু ফল্স। ওঃ, সে দেখলে তোরা মোহিত হয়ে যাবি। আরো আছে অনেক-কিছু। নে নে চটপট! চা-টা খেয়ে নিতে হবে।

ট্যাঁপা মদনা কখনো টেবিল-চেয়ারে বসে খায়নি, ভয়ে তাদের বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। তবু ম্যানেজ করে নিল। কেউ বুঝতে পারল না ওদের এই প্রথম। মদনই অবশ্য পথ-প্রদর্শক। ট্যাঁপা আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে অনুকরণ করে কাজ সমাধা করেছে।

ব্রেক ফাস্টের পালা সাঙ্গ হবার পর হোটেল-বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল বেরিয়ে পড়ল। বেরোনোর বহর দেখে বোঝা গেল 'হোটেল বিউটি'র খাঁজে-খাঁজে এত লোক ভরা ছিল।

জগবন্ধুও বেরিয়ে পড়লেন ছেলে দুটোকে নিয়ে। এখন সব ঘরের দরজায়-দরজায় তালা। শুধু একটি ঘর ভিতর থেকে বন্ধ—ডাক্তার তালুকদারের নিউ ব্লকের ছ' নম্বর ঘর। হোটেল সুনসান, কাজ করার লোকজনেরা এখন আবার নবোদ্যমে বোর্ডারদের লাঞ্চের আয়োজনে লেগে গেছে। গুঁফো ভদ্রলোক এদিক-ওদিক তাকিয়ে করিডোর পার হয়ে ছ' নম্বর ঘরের দরজায় টুকটুক করে টোকা মারলেন। দরজায় কলিংবেল আছে, তবু টোকাই মারলেন।

আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক হল। তালুকদারের মুখটি দেখা গেল। দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের ঠাসা বুনুনি। নাক মোটা, ঠোঁট পুরু, তবে রঙ বেশ ফর্সা। মুখ বাড়িয়েই হাসি-হাসি মুখে বললেন, আসুন।

আসব না। এই আপনি যা চাইছিলেন—বলে এক টুকরো পাট-করা কাগজ এগিয়ে ধরলেন গুঁফো। আবার দরজাটা আর একটু ফাঁক হল দেখে ঢুকেও পড়লেন।

কাগজটি আর কিছুই নয়, গুঁফোর আজকের সর্বশেষ বোর্ডারের

নাম-ঠিকানা। ভদ্রলোকের কলকাতার বাড়ির এবং যে-কলেজে পড়ান দুটোরই। হোটেলের খাতায় এসব লিখে না নিয়ে তো দেওয়া হয় না। ভবিষ্যতে পাছে কোনো গোলমালে পড়তে হয়, এই ভয়েই এই সাবধানতার নিয়ম।

তবে সাবধানতা ছাপিয়েও যে কিছু হতে পারে না তা তো নয়। গোলমেলে লোকেরা তো ইচ্ছে করলেই বানিয়ে-বানিয়ে বাজে নাম-ঠিকানা দিয়ে দিব্যি ঢুকে পড়তে পারে। পোশাকটা জুতসই হলেই হল। এই যে ট্যাঁপা মদনা, জগবন্ধু বোস যদি ওদের অমন ভব্যিযুক্ত করে সাজিয়ে না এনে, তাদের নিজ পোশাকেই নিয়ে চলে আসতেন, পেত ওই সুন্দর কর্ণারের ঘরটি? স্রেফ আউট হাউসে চালান করে দিত গুঁফো ওদের। কিম্বা সোজাসুজি জগবন্ধুকেই 'ঘর খালি নেই' বলে গেট দেখিয়ে দিত।

তালুকদার পাট-করা কাগজখানায় বার-দুই চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, হুঁ! মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছি।···হুঁ। কারেক্ট।

তালুকদারের ওই টুকুন পাঠকালে গুঁফো উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল নিয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে তাঁর মুখের রেখা পাঠ করছিলেন, এখন গলার স্বর খাটো করে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার বলুন তো? চেনেন বুঝি? কোনো গোলমেলে লোক নাকি?

তালুকদার অভয়হাস্যে বলেন, আরে না মশাই, ওই জগবন্ধু বোস আমার বাল্যবন্ধু। ছেলেবেলা থেকে এক স্কুলে পড়েছি। কলেজে উঠেও কিছুদিন। তারপর কোথায় কে! আর দেখা হয়নি।

অ্যাঁ! আর দেখাই হয়নি? তবু চিনতে পারলেন?

গুঁফোর কথার সুরে উত্তেজনা, এবং সন্দেহের আভাস।

তালুকদার অবশ্য শান্ত। বললেন, একবারে ঠিক চিনতে কি আর পেরেছি? তাহলে তো তক্ষুনি কী খবর বলে পিঠে থাপ্পড় কষাতাম। দেখেই কেমন চেনা-চেনা লাগল—তাই····

গুঁফোর তবুও সন্দেহের গলা, সেই স্কুল বয়েসের চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার মিল পেলেন?

পেলাম। ওই যে ডান ভুরুর ওপর একটি আঁচিল ওটি থেকেই! তবু নিঃসংশয় হবার জন্যেই এই আপনাকে খাটানো।

গুঁফো লজ্জায় ব্যস্ত হলেন, না না, সে কী? এ আর খাটা কী? তা ঠিকানাটা কাজে লাগল? মানে মানুষ তো আর চিরকাল একই ঠিকানায় বাস করে না।

বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে থাকলে করে। এই যে ষোলো নম্বর জামরুলবাগান লেন, এ ওদের ঠাকুর্দার আমলের বাড়ি। ছেলেবেলায় কত গেছি ওই ষোলো নম্বর বাড়িতে। স্কুলটা ওই পাড়াতেই, খুব কাছে। স্কুল-ফেরত ঢুকে পড়তাম।

আর দেদার জামরুল পেড়ে খেতেন? কেমন? গুঁফোর রসিকতার সাধ হল।

তালুকদারও হাসলেন, তাহলে তো হাতিবাগান, সিংহিবাগানের রাস্তা দিয়েও হাঁটতে হয় না। জামরুলবাগানে জামরুল ছিল না। তবে জগবন্ধুর মায়ের ভাঁড়ারে সর্বদা প্রচুর খাদ্য মজুত থাকত। তা ছাড়া নিজের ছেলের সঙ্গে যদি ছেলের কোন বন্ধু শুকনো-শুকনো মুখে হাজির হয়, কোন্ মা তাকে সমান করে খাবার না দিয়ে পারে? জগবন্ধুটা বেশি খেতে-টেতে পারত না, সেই নিয়ে ওর মা দুঃখ করতেন।

আর, আপনি তাঁর দুঃখ লাঘব করে দিতেন? বলে গুঁফো খিকখিক করে হাসতে থাকেন। এখনো, এই বয়সেও তালুকদারের খাওয়াটি বেশ ভালমতোই আছে, গুঁফোর সেটি অজানা নয়, তাই এই হাসি।

কিন্তু গুঁফোর কী-একটা নাম নেই?

আছে অবশ্যই। মানুষমাত্রেই নাম একটা থাকে। গুঁফোরও আছে। নাম নকুল নস্কর। নকুল নিজের নাম-প্রসঙ্গে বলে থাকে, মেয়েদের যেমন শাড়ি-ব্লাউস ম্যাচিং থাকে আমারও মশাই নামের সঙ্গে সারনেমের ম্যাচিং! পাঁচ ভাই আমরা, ঠাকুর্দা পঞ্চপাণ্ডবের নামে নাম রেখেছিল। তো কারুর সঙ্গেই 'নস্কর' তেমন খাপ খায় কি? শুধু আমারই—

নিজের নামের সম্বন্ধে এমন একটি মহিমা-বোধ থাকলেও আড়ালে ওঁকে প্রায় সবাই গুঁফোই বলে। এমন-কী ওঁরই নিজের হোটেলের লোকজন পর্যন্ত।

রাঁধুনি ছোটুলাল হাতায় করে গরম মাংসের ঝোল ফুঁ দিতে দিতে বলে, একটু পাহারা দে দিকিন ফাগুয়া, গুঁফো না হঠাৎ এসে পড়ে।

আবার ফাগুয়াও সুযোগ বুঝে বলে, গুঁফো এখন আপিসঘরে হিসেবের খাতা নিয়ে বসেছে দেখে এলাম, জম্পেস করে দুখানা পাঞ্জাবী পরোটা ভাজ দিকি লালবাবা। জুত করে খাওয়া যাক।

তা আশ্চয্যি, ট্যাঁপা আর মদনা, ওরফে মোহন দাস আর চরণ পাল—এরাও কেমন করে ওই নামটাই বাহাল করে ফেলল এই দুদিনে।

যদিও বিউটি হোটেলের চৌহদ্দির মধ্যে কমই থেকেছে এ দুদিন। জগবন্ধু তো ওদের স্বর্গ মর্ত পাতাল দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। আহা ওর আর কখনো সুযোগ পাবে কিনা ভেবে। বাসে, রিকশয়, ট্যাক্সিতে, পায়ে হেঁটে, কিসে নয়? খাওয়া-দাওয়া, ও তো বাইরে-বাইরেই সারা। তবু সন্ধে আর সকালে, ঢুকতে আর বেরোতে ওই গুঁফো মুখখানি না দেখে তো উপায় নেই। ঘাঁটি আগলে বসেই থাকেন।

তিনি তো আবার গোঁফের ফাঁকে আহ্লাদ গোপন করে বলেছেন, কী মশাই, স্রেফ মর্নিং-এর ব্রেকফাস্টটা ছাড়া আর তো কিছুই খাচ্ছেন না আপনারা? আপনাদের ভাগের খাবার ফেলা যাচ্ছে। আমার এটা বোর্ডিং আর লজিং দুইই, তা জানেন তো? মিছিমিছি দু' জায়গায় পয়সা খরচা করছেন কেন?

জগবন্ধু অবশ্য বলেছেন বাইরে দূরের দিকে বেরিয়ে পড়লে কোথাও খেয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

তবে মদনা জনান্তিকে বলে, গুঁফোবুড়োর চালাকিটি বুঝলি ট্যাঁপা? ভাবছে, আমরা খাচ্ছি না ভেবে টাকা কম দেব, তাই আগে থেকে শুনিয়ে রাখছে।····

তা তিনদিনের দিন জগবন্ধু ছেলে দুটো সমেত রাত্রে হোটেলেই

খাবেন ঠিক করে ছোটুলালকে ডেকে জানিয়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে আচমকা এক রদ্দা।

প্রায় 'আঁক' করে উঠে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার আগেই একটি মাইডিয়ারি গলা হৈ হৈ করে উঠল, উঃ, আজ তিন দিন ধরে চেষ্টা করেও তোকে ধরতে পারছি না। ফেরারী আসামীর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিস!

জগবন্ধু প্রায় বিহবল হয়ে তাকিয়ে দেখেন! এই সেই মুখ! প্রথম ঢোকার মুখেই চকিতে যার মুখদর্শন করেছিলেন, এবং যার পরিত্যক্ত আনলাকি থার্টিন ঘরটাই বাগিয়ে মনের আনন্দে বিছানায় শুয়েই সূর্যোদয় দেখছেন।

লোকটার কী যেন নামটা শুনেছিলেন? মনে হয়েছিল যেন জানা-জানা। ডাক্তার ডাক্তার কী যেন--

জগবন্ধু হতভম্ব হয়ে বলেন, আ—আমি তো আপনাকে ঠিক—

চিনতে পারছি না। কেমন? তা পারবি কোথা থেকে? বারো বছর মাস্টারী করলেই তো শুনেছি 'ইয়ে' অবস্থা ঘটে। আর তোর তো বোধহয় দু-বার বারো হয়ে গেল, তাই না? নাকি আরো বেশি?

এত কথার ফুলঝুরি, তবুও জগবন্ধু যে তিমিরে, সেই তিমিরে। প্রায় হাঁ করেই তাকিয়ে দেখতে থাকেন তিনি ওই গোলগাল থ্যাবড়া-নাক, পুরু-ঠোঁট কুদৃশ্য মুখটার দিকে। নেহাত নাকি রংটা ফর্সা তাই তাকানো যাচ্ছে, নচেৎ তাকানোই যেত না। কিন্তু একে আবার কবে দেখলেন জগবন্ধু? অথচ এ তো জোরসে তুই চালাচ্ছে।

তা হাঁ হয়ে যাচ্ছেন পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব নকুল নস্করও। ডাক্তার তালুকদারের সঙ্গে নকুলের অবশ্য বেশ আঁতাত আছে, কিন্তু কথাবার্তা সমীহের ওপরেই। সংক্ষিপ্তও। এমন মাইডিয়ারি একখানা গলা যে আছে তালুকদারের তা কোনো দিন জানা ছিল না নকুল নস্করের।

কী হল? চিনতে পারলি না তো?

জগবন্ধু হতাশ-হতাশ গলায় বলেন, না, মানে, কোথাও দেখেছি ঠিকই তবে কোথায় কবে—

সে-সব মনে পড়ছে না! এই তো? ডাক্তার তালুকদার বলেন, তাহলে জিজ্ঞেসই করে ফেলি মাস্টারমশাইকে, আপনি কি কখনো জামরুলবাগান লেনের প্রসন্নকুমার বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন স্যার? আর ওই স্কুলেরই যে একটা পেটুকচাঁদ ছেলে স্কুল-ফেরত আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়ে আপনার মাকে তোয়াজ করে করে দারুণ সেঁটে আসত, তাকে মনে পড়ছে না স্যার?

পেটুকচাঁদ!

জগবন্ধুর চোখের সামনে থেকে যেন একটা কুয়াশার পর্দা সরে গেল। ওঃ, তাই সেদিন তালুকদার শব্দটা শুনে কেমন যেন জানা-জানা লাগছিল। সেটা তাহলে শুধু ওই শব্দটার জন্যেই নয়, ওই থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট আর কুতকুতে চোখ দুটোর জন্যেও।

বলে উঠলেন, দীনেশ! দীনেশ তালুকদার!

যাক বাবা। মনে পড়েছে তাহলে? তালুকদার বলেন, আমি কিন্তু সেই প্রথম দিনেই—ওঃ, কত দিন পরে দেখা! তা যাক, আছিস ক'দিন?

জগবন্ধু অবশ্য ওর মতো অত উচ্ছ্বসিত হতে পারছেন না। তবু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, আছি কিছুদিন। ছুটিটা তো লম্বা।

গুড্! ডাক্তার তালুকদার বলে ওঠেন, তবে আর ছাড়াছাড়ি নেই। ছুটিটা আমার ওখানে কাটাবি চল।

আ-আ-মানে তোমার ওখানে?

হ্যাঁ, আমার ওখানে। এই রাঁচিরই লাগোয়া····

এ-সময় নকুল নস্কর এগিয়ে আসেন ঘটনার নৌকোটাকে আরো একটু ঠেলে দিতে। ডাক্তারবাবু আপনার বাল্যবন্ধু! কী আশ্চর্য যোগাযোগ মশাই। তা শুনলাম সেই স্কুলের বেলা থেকে আর দেখা নেই। ওনার বর্তমানের পরিচয় জানেন কি?

জগবন্ধু অপ্রতিভ মুখে বলেন, কই আর?



নকুল নস্কর উদাত্ত গলায় বলেন, যার জন্যে এই রাঁচির নামডাক পাগলাগারদ, ইনি হচ্ছেন সেখানের একজন নামকরা ডাক্তার।

অ্যাঁ। তাই নাকি ?

তালুকদার লজ্জার ভান দেখিয়ে বলেন, আঃ নকুলবাবু, ছাড়ুন না। নামকরাটরা কিছু নয়।

নয় তো কী ?

নকুল নস্করের গলা আরো জোরালো হল, তবে কি শুধুমুধু আপনাকে ওই বিরাট বাগানওলা বিশাল কোয়ার্টাসখানা দিয়েছে ডাক্তার তালুকদার ? শুনুন প্রফেসর বোস, আলাদা ভাবে স্পেশাল ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে রিসার্চ করতে নিজের বাড়িতেই ছোটখাটো একখানা পাগলাখানা খুলেছেন ইনি। কোম্পানী তার খরচা জোগাচ্ছে। গিয়েছিলাম একবার। ল্যাবরেটরিতে সে কী সব যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র! দেখে তো মশাই তাক লেগে গেল।

জগবন্ধু একটু বোকার মতো বলে ফেলেন, জায়গাটা কোথায় ?

কোথায় কী ? ওই আসল পাগলা-গারদের কাছাকাছি, কাঁকেয়। রাঁচি রাঁচি বলা হয়। চিরকাল সবাই জেনে আসছে রাঁচির পাগলা-গারদ। আসলে কিন্তু ও-জায়গাটার নাম কাঁকে।

তা জানি !

ব্যাস্ ঠিক আছে—

ডাক্তার তালুকদার বলে ওঠেন, কালকেই আমার এখানের কাজ মিটে যাচ্ছে, পশু চলে যাচ্ছি। তোকেও নিয়ে যাচ্ছি। মিস্টার নস্কর, অর্থাৎ আপনার একটি বোর্ডার খসিয়ে নিচ্ছি।

নস্করের অবশ্য এতে খুব আহ্লাদ হবার কথা নয়, তবু সৌজন্যের হাসি হাসতে হয়। বলতেই হয়, বিলক্ষণ ! আপনার যখন বন্ধু—

যদিও পাগলা-গারদ, স্পেশাল ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে রিসার্চ—এই সব আকর্ষণীয় কথাগুলো মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে জগবন্ধুর, তবু হঠাৎ ওর সঙ্গে চলে গিয়ে ওর বাড়িতে থাকা, সেটা কি সম্ভব ? শুনতেই বাল্যবন্ধু, সত্যি বলতে তো অজানা অচেনা।

যুক্তির বাঁধ দেন জগবন্ধু, বলেন, আরে আমি তো আর একা নই ? সঙ্গে তো দুটি ল্যাংবোট আছে।

তালুকদার ইতিপূর্বেই জেনেছেন, ছেলেদুটো জগবন্ধুর ছেলে নয়, তবু উড়িয়ে দেবার সুরে বলেন, জানি, তোমার ছেলেরা আছে তো ? সে তো আরো ভাল। বাড়িতে তো ছেলেপেলে নেই। ওই বিরাট বাগান, খোলামেলা, ফলের গাছও বিস্তর। দেখিস, ওদের খুব ভাল লাগবে।

জগবন্ধু আস্তে বললেন, ওরা মোটেই আমার ছেলে নয়। কোথায় পাব ? সংসার-ফংসার তো করিনি। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাড়িতে সাধন আর আমি। ওরা আমার বলতে গেলে দৈবলব্ধ ভাগ্নে-ভাইপো। কিন্তু তোমার বাড়িতে কেউ নেই কেন ? তুমিও কি—

তালুকদার তার জবাবে হৈহৈ করে যা-সব বলে ওঠেন, তার সারার্থ হচ্ছে, সবই আছে তাঁর, ভাই বোন বৌ ছেলে মেয়ে, মায় বুড়ো বাপ পর্যন্ত। তারা কেউ এখানে থাকতে চায় না। তাদের নাকি এখানে বিচ্ছিরি লাগে। থাকে পুরুলিয়ায়, তালুকদারের ছোট ভাইয়ের বাসায়। তালুকদার মাঝে-মাঝে দেখতে যান, আর যখন-তখন গাছের ফলটল পাড়িয়ে পাঠিয়ে দেন। দূরত্ব বেশি নয় রাঁচি থেকে।

জগবন্ধু আরো ওজর-আপত্তি করলেন, খাটল না। ডাক্তারের যেন মরণ-বাঁচন প্রতিজ্ঞা। না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন না।

বাল্যবন্ধু ! এত আকুলতা করছে, আর কত ঠেকাবেন ? সেন্টিমেন্ট বলে একটা জিনিস নেই ? শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলে বললেন, তোমার আনলাকি ঘর কিন্তু আমার লাক খুলে দিল। এমন একখানা হারানো বন্ধু ফিরে পেলাম। তাছাড়া যা চাইছিলাম, তা হাতে এসে ধরা দিচ্ছে।

এই, তোরা যে দেখছি ভগবানের বরপুত্তুর। জগবন্ধু হেসে-হেসে বলেন, হাত না বাড়াতেই হাতে চাঁদ এসে পড়ছে। নে, এখন কত পাগল দেখবি, দ্যাখগে চল। একেবারে খোদ পাগলাখানায় নেমন্তন্ন। শুনলে তাক লেগে যাবে।

কিন্তু শুনতে কি কিছু বাকি আছে নাকি টঁ্যাপা মদনার? ওই আলোচনার মাঝখানে উপস্থিত না থাকলেও আলোচনার একটু অংশও ওদের কানছাড়া হয়নি। দিব্যি একখানা মারকাটারি জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে খুব ভ্যাবলা মুখে বসে, চারটি আজেবাজে কাগজ জড়ো করে নিয়ে কাগজের নৌকো বানাচ্ছিল। নৌকো, ফুল, দোয়াত, এরোপ্লেন, কাঠঠোকরা! এটা এরা খুব ভালই জানে। শুধু একটু ভাঁজ করার কৌশলে, এক টুকরো কাগজ থেকে কত কীই গড়নের জিনিস হতে পারে।

তা এইগুলো নিয়ে বসার সুবিধে এই, ছেলে দুটো এখানে অকারণ বসে কেন, বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে, কী বোকা ছেলে রে বাবা। ধাড়ি-ধাড়ি ছেলেরা এই খেলা খেলছে?

জগবন্ধু ওদের কাছে তাক-লাগানো কথা বলার প্রায় আগেই মদনা বলে ওঠে, জানি। ওই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেতে হবে তো! উনি পাগলা-গারদের ডাক্তার তো?

ঠিক! কিন্তু তোদের কে বলল?

কেউ বলেনি, নিজেরাই শুনেছি। কিন্তু জ্যাঠাবাবু, এই লোকই ঠিক আপনার বন্ধু ছিল তো?

ছিল কী রে? এখনো তো আছে। সব শুনেছিস যদি তো ওর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলিও শুনেছিস?

সবই শুনেছি, কিন্তু মানুষটা যে কেমন সেই ভাবনা। ছোটকালে এক স্কুলে পড়েছে বলেই কি সে-লোক মহাপুরুষ হয়ে গেছে? ওনাকে আমার ইয়ে-মতন লাগে।

ইয়ে মতো? সেটা কী?

মানে আর কী, সে আমাদের ভাষা, আপনি বুঝবেন কি? বেশ সুচাকের লাগে না।

কী মুশকিল। ওনাকে দেখলি বা কখন?

এই সময় টঁ্যাপা মদনকে অলক্ষ্যে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিল। একটা ইশারা। ইশারাটা হচ্ছে, ওই তালুকদার ডাক্তার যে ক'দিনই

রাত্তিরে ট্যাঁপাদের ঘরের বাগানধারের জানলা দিয়ে উঁকি মারে এ ওরা টের পেয়েছে। বলব কি বলব না ভেবে চুপচাপ ছিল, সেটা এখন বলবে কিনা।

এখন ট্যাঁপার ইশারায় মদনও একটা সূক্ষ্ম চিমটি দিয়ে ইশারা দেয়, এখন থাক।

কী রে, চুপচাপ যে? আহ্লাদে দু' বাহু তুলে নাচা উচিত তো তোদের? যার জন্যে রাঁচি আসা, তাই সার্থক হচ্ছে, একেবারে সুবর্ণ সুযোগ!

মদনা বলে ওঠে, ভগবানের এত দয়া, বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না জ্যাঠাবাবু। ভয় লাগছে, কোনো অঘটন ঘটবে না তো?

কী অঘটন? তোকে ধরে গারদে পুরে দেবে? বলে হাহা করে হেসে ওঠেন প্রফেসর জগবন্ধু বোস, যে-হাসিটির জন্যে তিনি ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয়।

।। চার ।।

টানা মোটরেই ডাক্তার তালুকদারের আস্তানায় চলে আসা হল। পথের দুধারে অপূর্ব সৌন্দর্যময় পরিবেশ। সেই পরিবেশের মাঝখান দিয়ে এতখানি মোটরগাড়িতে আসা।

ট্যাঁপা আর মদনা সারাক্ষণ ফিসফিস করে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে?

এত সুখ কি ললাটে সইবে রে মদনা? ভয় হচ্ছে।

য্যাতোক্ষণ সইছে ভোগ করে নে। চিন্তা করে দুঃখ ডেকে এনে লাভটা কী?

ডেরাইভারের মুখে কোন বাক্যি-ওক্যি নাই ক্যানো রে মদনা? বোবা না তো?

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে এরা খুব সাবধানে সভ্য সাধুভাষায়

বলতে চেষ্টা করে, অন্যদের অনুকরণে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে একটু গা ছেড়ে দেয়।

মদনা বলে, বড়মানুষদের ডেরাইভারদের সোমায় বিশেষে বোবা-কালা-অন্ধ সব হতে হয় রে ট্যাঁপা। খোঁড়া আর নুলোটা বাদে।

এত বড়মানুষ দেখলি কোতায় তুই?

কলকেতায় জম্মো-কম্মো, কলকেতার জলে হাওয়ায় মানুষ, সেটা ভুলে যাসনে ট্যাঁপা। তবে তোর মতন আকাশচোখো হলে আলাদা।

গাড়িটা কেমন দেখছিস ট্যাঁপা?

দেখছি। টেক্সিগাড়ির মতন তো না। পুলিস ভ্যানের মতন লাগতেছে।

ভ্যানই! পাগলা-গারদের কোম্পানীর গাড়ি। ডাক্তারকে ব্যাভার করতে দেছে।

আমরা হয়তো মিছে সন্দ-মন্দ করছি রে মদনা। হয়তো লোকটা খারাপ না। নচেৎ কোম্পানী এমন একটা উচ্ পোস্টে বোস করিয়ে রেখেছে?

মদনা বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, উঁচু জাতের মানুষরাই শুধু উঁচু 'বোস' করে থাকে এই বুঝি তোর ধারণা ট্যাঁপা?

ওদিকে ভ্যানের সামনের আসনে দুই বাল্যবন্ধুর গল্প উঠেছে জমে। আর জগবন্ধু বোস ভাবছেন, তালুকদারের মনটা মেজাজটা সত্যিই খুব উঁচু। খুব ভাগ্যবশেই এতদিন পরে এমন অভাবিত ভাবে একটা বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা।...যদিও জগবন্ধুর প্রথম দিকে মনটা একটু বিরূপই ছিল। কারণ যতই ভুলে-যাওয়া স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন ততই একটা স্বার্থপরের রাজা, দুষ্টুবুদ্ধির জাহাজ, ফিচেলের সর্দার ভোঁদড়মুখ ছেলেকেই মনে পড়ছিল।

কিন্তু লোকটার বর্তমানের ব্যবহারে সে মনোভাবটা পালটাল। মানুষ তো বদলায়। কত বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এমন কী মহা-পুরুষরাও ছেলেবেলায় দুষ্টুর শিরোমণি ছিলেন, এ-কথা কে না জানে?

তালুকদারের ডেরায় যখন পৌঁছনো হল, তখন সন্ধে হয়-হয়।

দূর থেকে বাড়িটা প্রায় জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছিল। কাছে এসে তবে বোঝা গেল বিশাল বাগানের মধ্যে অবস্থিত একখানা মস্ত বাড়ি। অবশ্য একতলাই, শুধু সিঁড়ির মাথায় একটা লম্বা-মতো ঘর। কে জানে কী হয় ও-ঘরে।

ওদের নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার নিঃশব্দে কুনিশ করে গাড়িখানাকে নিয়ে কোন্ দিকে যেন চলে গেল।

তালুকদার হাঁক পাড়লেন, জীবনরাম!

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মাটি ফুঁড়েই জীবনরামের আবির্ভাব। পরনে একটা ডোরাকাটা পায়জামা, নীল হাফ শার্ট. আর তার ওপর একটা হাতকাটা সোয়েটার।...তা সোয়েটার লাগবে। এই অরণ্যপুরীতে রীতিমত হিমেল হাওয়া বইছে।

জীবনরাম, এই ছ্যাখ আমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে এলাম। ছেলেবেলার বন্ধু। খুব যত্ন-টত্ন করবি। আর এই তু'জন এঁর ভাগ্নে-ভাইপো। এদের সঙ্গে করে নিয়ে যা, হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দিবি। এঁকে আমি আমার বাথরুমে পাঠিয়ে দিচ্ছি। চটপট চা-টা নিয়ে আসবি, বুঝলি? আর রাত্রে কী খাওয়াচ্ছিস?

মনে হচ্ছিল জীবনরামও বুঝি বোবা। কারণ আশ্চর্য একখানা ভাবশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এতক্ষণে কথা বলল, যা অর্ডার করবেন।

বাঃ, আমি তো ক'দিন বাড়ি নেই। তোর স্টকে কী আছে না-আছে—জানি? কী আছে শুনি?

জীবনরাম যন্ত্রের মতো আউড়ে গেল, দেরাতুন রাইস, মুগের ডাল, বুটের ডাল. আলু. পিঁয়াজ, ডিম, মাখন, চিনি, মশলা. হাঁস, মুরগি ভেড়া, শুয়োর—

সর্বনাশ। থাক থাক।

জগবন্ধু শিউরে ওঠেন, শুনে মাথা ঘুরে গেল। শুধু ভাতডাল আর আলুভাজা হলেই যথেষ্ট। একার সংসারে এত মাল মজুত থাকে?

একার সংসারে? তালুকদার একটি রহস্যময় হাসি হেসে বলেন,

দেখো কাল পুষ্যির বহর। ওদের জন্যেই চাষ-আবাদ পোলট্রি। আলু পিঁয়াজ চিনেবাদাম এ সবই আমার জমিতে হয়। সবজি তো হয়ই। সব লাগে।

ওঃ। পুরুলিয়ায় পাঠাও তো। তাই না?

পুরুলিয়া? সে তো ঝড়তি-পড়তি যা থাকে। সবই এখানে লাগে। ঠিক আছে, সবই দেখাব কাল।

জগবন্ধু আর তাঁর ভাইপো-ভাগ্নের জন্যে বেশ রাজকীয় গেস্টরুমের ব্যবস্থাই করলেন তালুকদার। পাশাপাশি দুখানা ঘর তাঁর ওইজন্যেই সাজানো থাকে।

কার্পেট পাতা ঘর, ডানলোপিলোর বিছানা, চেয়ার টেবিল, আয়না-টেবিল, সোফা, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদিতে নিখুঁত।

জগবন্ধু বললেন, তোমার এই অরণ্যপুরীর মধ্যে খাবার আড়ম্বর দেখেই তো তাক লাগল ভাই দীনেশ, আবার শোবার আয়োজন দেখে যে ইয়ে হয়ে যাচ্ছি। আবার অদ্ভুতও লাগছে। এই দু'দিন আগেও কোথায় তুমি কোথায় আমি। আর এখন—

তুই কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমায় তুই বলতে পারছিস না। তার মানে আপন ভাবতে পারছিস না।

হবে হবে, অভ্যাস হয়ে যাবে। বলে জগবন্ধু তালুকদারের পিঠটায় আলতো থাবড়া বসালেন। তারপর বললেন, তা তোমার নিজের বেডরুমটা কোন্ দিকে? ছাতের ওপরকার ওইটা বুঝি?

না, না, মোটেই না। তালুকদার যেন দারুণ একটা অসঙ্গত কথা শুনলেন। তাই চমকে উঠলেন। ওটা আবার একটা ঘর নাকি? একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, ও হচ্ছে একটা বাজে মালের গোডাউন। বা বলতে পারিস ভাঙা লোহাদের কবরখানা।

তাহলে তোমার ঘর কোথায়?

আছে হে আছে। ঝোপ জঙ্গল জন্তু-জানোয়ারের কাছাকাছি আছে কোথাও। আচ্ছা গুড্ নাইট! ভাগ্নে-ভাইপোরা শুয়েছে?

হুঁ। তোমার ওই জীবনরাম পাশের ঘরটায় নিয়ে গেল। লোকটা খুব খাটতে পারে।

খাটার এখুনি দেখলে কী? তালুকদার একটু মুচকি হাসলেন, দেখো কাল সকালে।

তারপর চলে গেলেন।

লোকটার, সবই কেমন যেন রহস্য-রহস্য দেখছিস মদনা?

আমি তো দেখছিই। তুই কী দেখলি বল শুনি?

ওই তো মামাবাবুকে এত সাপ্টে-পাপ্টে ধরা। অকারণে ঘুর-ঘুর করা আর মুচকি হাসি, আবার ওই ছাতের ঘরটার নামে কী রকম হাঁ-হাঁ করে ওঠা, ওই জীবনরামটার সঙ্গে হঠাৎ ইশারা। আবার বলল কিনা এখন খাটুনির কী দেখলে? দেখো কাল সকালে। ভগবান জানে কী সেটা।

সেটাই চিন্তে করছি। তবে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, বুঝলি ট্যাঁপা।

তাই দেখছি। বেশ ছিলাম হোটেলে বিউটিতে। গাদাগাদা পাগল দেখাবে বলে লোভ দেখিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে তো এল, এখন গ্যাখ সত্যি দেখায় কিনা।

তালুকদারের এই গেস্টরুমে ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়ে আছে চিরদিনের হতভাগা ছেলে দুটো। ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলছে দেখাচ্ছে যেন পরী-রাজ্য। কিন্তু স্বস্তি নেই।

সন্দর অধিক দুঃখ নাই রে মদনা। এই যে ঘরটায় শুতে দিয়েছে আমাদের, মনে হচ্ছে বুঝি বা মরে গিয়ে সগ্‌গে চলে এইচি। অ্যাতো আরাম, অ্যাতো ঐশ্বর্য, রাজার জামাইয়ের তুল্যি আদর, তবু পেরানে কোনো সুখ পাচ্ছিনে কেন বল? ওই সন্দর জন্যে। লোকটা যদি মামাবাবুর মতন হত। আহা।

ওনার তুল্যি মানুষ পৃথিবীতে কটা আছে রে?...আচ্ছা, চোখটা এমন জড়িয়ে আসতেছে ক্যান্‌ রে ট্যাঁপা?

আমারও, হেভি খাওয়ার জন্যে বোধহয়।

বলতে-বলতেই ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। বেশি রাত্রে কে একজন কালো চাদর মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এসে খাটের তলা থেকে কী একটা নিয়ে যায়। ওরা টেরও পায় না।....

এ-অবস্থা জগবন্ধুরও ঘটেছে। বালিশে মাথা ফেলতে না-ফেলতে ঘুম। রাত্রে কেউ ওঁর ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে যেতে আসেনি।....

।। পাঁচ ।।

ঘুম ভাঙল সকাল বেলা একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে। একটাই বা বলা যায় কী করে, অনেকগুলো একত্রে। চিৎকার করে গাঁক-গাঁক করে অনেকগুলো উদ্দাম কণ্ঠ বলে চলেছে, ওরে বাবারে, আর মারিসনি রে। ওরে পাজি শুয়োর বদমাশ শয়তান, ছেড়ে দে বলছি।....ওরে হারামজাদা রাক্ষোস! তোকে হাজার-হাজার টাকা দেব, ওরে লাখ-লাখ টাকা দেব, ওরে, তোকে পৃথিবীর রাজা করে দেব। ওরে লক্ষ্মীছাড়া নেকড়ে শেয়াল গণ্ডার, তোকে জুতো মারব....

বলেই চলেছে, আরো অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, আর অকথ্য গালাগাল, ঘরে বসে কান খাড়া করে শুনতে-শুনতে হাত-পা হিম হয়ে যায় ট্যাপা মদনা আর জগবন্ধু বোসেরও। আর হঠাৎই তিনজনে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে শব্দ লক্ষ করে বাগানের দিকে চলে যায়।

কী সর্বনাশ, এ কী দৃশ্য! এমন একটা দৃশ্য কে ভেবেছিল!

গাছগাছালির মধ্যে একটা টানা লম্বা টালির ছাদের ব্যারাক। তার সামনে লম্বা প্যাসেজে সারিসারি খুঁটি গাড়া আছে। আর প্রত্যেকটা খুঁটির সঙ্গে একটা করে বীভৎস চেহারার মানুষ শেকল দিয়ে বাঁধা। চেঁচাতে-চেঁচাতে মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। জীবনরামের হাতে একখানা চাবুক, সে একধার থেকে লোকগুলোকে পাইকারি হারে চাবুক বসিয়ে যাচ্ছে। আর একটু দূরে তালুকদার একখানা

চেয়ারে বসে গুনে যাচ্ছেন···দশ নম্বরকে আর তিন ঘা, এগারোকে আরো পাঁচ। সাতকে আর নয়, থামা দে। ষোলোকে চালিয়ে যা।

দূরে থেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে জগবন্ধু বোস দু'হাত উর্ধ্বে তুলে ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে আসেন। এ কী! এ কী দীনেশ! এ কী ভয়ানক কষ্ট! থামাও! থামাও! কে এরা?

তালুকদারের ইশারায় জীবনরাম হাতটা থামায়। সেই অবকাশে লোকগুলো আরো চেঁচিয়ে ওঠে, ও বাবুগো, আপনি পুলিশ ডেকে আনো। এই রাক্কোসটা মানুষ ধরে এনে খায়। আর ওর এই শাকরেদটা? নরকের শয়তান।

জগবন্ধু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তালুকদার।

বুঝতে পারছ না? কী আশ্চর্য! ওরা আমার পেশেণ্ট! তালুকদার গভীর সমবেদনার গলায় বলেন, বেছে বেছে কিছু কিছু পেশেণ্টকে স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট করার জন্যই তো আমার এই কেয়ারহোম খোলা। পাগলাখানা থেকে এনে রেখেছি এদের।

সব মিছে কথা! সব মিছে কথা! একটা লোক লোহার শিকলটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে-করতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ওই ইস্টুপিড, রাস্কেল, খ্যাঁকশিয়াল, বুলডগ, গণ্ডার, হায়না, হাঙর, কুমীর ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবেন না, মোশাই! পেশাল কেয়ার! পেশাল কেয়ারের জন্যে নিজের হোমে এনে ঢুকিয়েছেন উনি। বেম্মতালুতে গজাল পোঁতার নাম ট্রিটমেণ্ট। শয়তান! জোচ্চোর। ও বাবুমশায়, ওই পাতুকি লোকটাকে আপনি গুলি করে মেরে ফ্যালেন! গুলিতে খুলি উড়িয়ে ছ্যান। নচেৎ থানায় খবর দিয়ে ছ্যান। পুলিশে ধরে নিয়ে যাক। গরমেণ্ট কখনো অ্যাতো অত্যেচার সহ্য করে? টের পেতেছে না, তাই। আপনি যান বাবু, পেলিয়ে যান, এর কবল থেকে পেলিয়ে যান। গিয়ে থানায় খবর দিন।

চাবুক বন্ধ হওয়ায় আর একটা পাগলা ট্যাঁপাদের লক্ষ করে বলে

ওঠে, ও দাদাবাবুরা, আমিও এককালে আপনাদের মতন বি. এ., এম. এ. পাশ করেছিলাম। আমার মায়ের ঘরের দেওয়ালে আমার গাউন-টুপি-পরা ছবি আছে গো! আমার একটা বদমাশ কাকা ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ফর নাথিং আমায় এখানে ধরে এনে বেঁধে রেখেছে। ফিরে গিয়েই আপনারা এই ঘটনাটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দ্যানগো। রিপোর্ট দেবেন, এই সেই বদমাশ ডাক্তার! কেস আদালতে উঠলে এই পিশাচটাকে ঠিক ফাঁসিতে লটকে দেবে। ফাঁসি! ফাঁসি!

একসঙ্গে সব-কটা লোকই চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাঁসি চাই, ফাঁসি!

প্রায় সবগুলো লোকই কোমরে-বাঁধা লোহার শিকলটা ছিঁড়তে চেষ্টা করে, নোখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে। পরনে যেটুকু আবরণ ছিল, তাও ছিঁড়ে ফেলে দেবার তাল করতে থাকে।

ফের! ফের! জীবনরাম আবার চাবুক তোলে, আবার বদমাইশি? চাবুকটা দেখায়। ওর পক্ষে যথেষ্ট কথা বলেছে।

তালুকদারও চেঁচিয়ে ওঠেন, খবরদার! বেশি বেয়াড়াপনা করলে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেব! মনে নেই—লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেবার কথা? বালির গাদায় মুখ ঘসটানো?

জগবন্ধু আর্তনাদ করে ওঠেন, এইভাবে শাস্তি চালাও তুমি?

তা কী করব? শায়েস্তা করতে হবে না? এরপর ভয়ানক অসভ্যতা করবে!

তালুকদার, আমায় ভাই ছেড়ে দাও। আমি ফিরে যাই। আমার মাথাটা কেমন করছে।

ভয় পাচ্ছিস? তালুকদার মুচকি হেসে বলেন, আরে বাবা, যে-রোগের যে-ওষুধ। দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবি। পাগলের পক্ষে ধমক আর মারই ওষুধ, বুঝলি? যতক্ষণ না এই ওষুধটি পড়বে, ওদের নার্ভগুলো চড়েই বসে থাকবে, নামবে না। মুখ ধোবে না, চান করবে না, খাবে না, ঘরের মধ্যে যা-তা কাণ্ড করে নরককুণ্ড বানিয়ে বসে থাকবে। কাজেই সকালবেলাই একটা হেভি ডোজ

দাওয়াই দিতে হয়।

ফের মিথ্যে কথা? একটা লোক মুখে আঙুল দিয়ে বলে, চুপ! চুপ! একদম চুপ! আগে পাগল ছিলাম আমরা? তুই পাজি পিশাচ, আমাদের পাগল বানিয়ে দিসনি?

তালুকদার জগবন্ধুর ব্যথিত বিব্রত কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, ছ্যাখ জগবন্ধু, সব শেয়ালের যেমন এক রা, সব পাগলেরও তেমনি! সবাইকার একই অভিযোগ, বুঝলি? তাদের ধারণা, আসলে তারা খুব ঠিক। পুরো সুস্থ, লোকে শত্রুতা করে তাদের শুধু-শুধু পাগল বলে গারদে ভরে রেখেছে। চল্‌-না, আজ দেখিয়ে আনব পাগলাখানা। মানুষ দেখলেই সবাই ওই একই কথা বলতে বসবে। তাদের নাকি আত্মীয়জন ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র-করে এখানে ফেলে রেখে দিয়েছে। এই যে এখানেই একজন রয়েছেন, তাঁর ধারণা তিনি অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট। লোকেরা বদমাইশ ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সাংঘাতিক সাংঘাতিক ইনজেকশান দিয়ে ওনাকে বাঙালী বানিয়ে আর পাগল সাজিয়ে এখানে ভরে রেখে দিয়েছে।

শাট আপ! একটা ভয়াবহ চেহারার লোক বলে ওঠে, আবার মিছে কথা? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? ভারতের রাষ্ট্রপতি না? তা তুইই তো সেই বদমাশ ডাক্তার। তুই আমায় পাগল বানাসনি? রোস না, একবার নিজের গদিতে গিয়ে বসতে দে—তোর কী হাল করি দ্যাখ। তোকে জ্যান্ত গোর দেব। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব, তোকে পিটিয়ে-পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব। তোর বেম্মতালু ফুটো করার ব্যবসা চালানো বার করব!

জগবন্ধু কাতরভাবে বলেন, আচ্ছা দীনেশ, তখনো যেন মাথা ফুটো না কী যেন বলছিল, এখনো এ বলছে, বেম্বতালু ফুটো করা! হঠাৎ এ ধরনের কথা বলছে কেন বলো তো?

তালুকদার মধুর হেসে বলেন, ছাগলে কী না খায়? আর পাগলে কী না কয়?—এ তো ভাই চিরকেলে কথা।···চল চল, এখন চা খাওয়া হোক। বেলা হয়ে গেল তোদের।

হোক! জগবন্ধু বলেন, খেতে মন লাগছে না। আচ্ছা, রোজই এইভাবে এদের চড়া নার্ভ নামানো হয় নাকি?

উপায় কী? সাধে কি আর বলেছিলাম, জীবনরামের খাটুনি দেখো সকালে। চাবুক চালিয়ে-চালিয়ে লোকটার হাতে কড়া পড়ে গেছে।

হঠাৎ ট্যাপা বলে ওঠে, আর আপনার বোধহয় মনে কড়া পড়ে গেছে।

তালুকদারের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। তবু ব্যঙ্গহাসি হেসে বললেন, তোমার এই ভাগ্নেটির কথাবার্তা বেশ মজাদার জগবন্ধু। যাক, দেখলে তো ট্রিটমেন্টের ফল? এখন সব চুপ। এইবার মগ-ভর্তি চা, আর গোছা-ভর্তি রুটি নিয়ে বসবে। তখন দেখো ফুর্তির বহর।

দেখা গেল সত্যিই বটে! জীবনরাম একটা ঠেলাগাড়ির মতো চাকা-দেওয়া সরু টেবিলের ওপর সারি-সারি ইয়া-ইয়া মগে ভর্তি করে চা, আর টিনের থালায় করে মোটকা মোটকা রুটির গোছা নিয়ে আসছে। পাগলগুলোর মুখে আহ্লাদের ছাপ। চোখ চকচকে।

কিন্তু এখন আবার মদনা বলে ওঠে, চাবুক থামিয়েছেন তাই চেঁচানি থেমেছে। আরও একবার চাবুক চালিয়ে দেখুন-না! দেখুন কী করে। কী বলেন জ্যাঠাবাবু?

তালুকদারের মুখটা এখন আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। বললেন, তোমার এই ভাইপোটি তো খুব জ্যাঠা জগবন্ধু।

চায়ের টেবিলে বসে তালুকদার তাঁর বন্ধুর জ্যাঠা ভাইপো আর মজাদার ভাগ্নের দিকে অলক্ষ্যে একটি কটাক্ষ হেনে, মোলায়েম গলায় বললেন, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো হে। হাওয়া-বদলে খাওয়া বাড়ানো দরকার। জীবনরাম, দাদাবাবুদের আর দুখানা করে টোস্ট, আরও দুটো ডিমসেদ্ধ আর কিছু ফল-টল দাও তো। জগবন্ধু, তোমাকেও ভাই দিক আর-কিছু।

জগবন্ধু হৈ-চৈ করে উঠলেন, অসম্ভব! আর কিচ্ছু না।

আরে রাঁচির জল-হাওয়ায় লোকের তো খুব খিদে বেড়ে যায়।

লোকের যেতে পারে। আমার আর চলবে না। তবে এরা যদি—কী রে, তোদের দেবে না কি আর কিছু?

ছেলে দুটোর নাম কিছুতেই মনে থাকে না জগবন্ধুর, এই হয়েছে জ্বালা। নোটবুকে লেখা আছে বটে, কিন্তু সবসময় তো আর নোটবুক নিয়ে বেড়ানো যায় না। আর তা গেলেও, ভাগ্নেকে ডাকবার সময় প্রতিবার নোটবুক খুলে-খুলে দেখাও যায় না: তাই এই তোরা অথবা এদের ওদের বলে চালানো।

ওরা অবশ্য খাওয়ার ব্যাপারে অরাজি নয়, সঙ্গে-সঙ্গেই তাই ঘাড় হেলায়।

তালুকদার হুকুম করেন, জীবনরাম, সেদ্ধ ডিম তো খাওয়ালে, চটপট দুটো দুটো ডিম ভেজেও দিতে পারো। কিম্বা ডবল ডিমের পোচ। কণ্ঠে স্নেহ আর আতিথ্য যেন ঝরে পড়ে।

জগবন্ধু মনে-মনে লজ্জিত হন। লোকটাকে খুব খারাপ ভাবছিলাম, তা তো নয়। কী করবে, যা প্রফেশান নিয়েছে! আর যা নিয়ে রিসার্চ করছে। এই যে সার্জেনরা পেশেণ্টদের ধরে-ধরে অপারেশন করে! কাটাছেঁড়া, হাত-পা উড়িয়ে বাদ দিয়ে দেওয়া, কত কী-ই করতে হয়! তাদের কি আর নিষ্ঠুর নৃশংস বলা হয়? মনটা নরম হয়ে গেল জগবন্ধুর। আর একেবারে গলে জল হয়ে গেল তালুকদারের পরবর্তী কথায়। উদাস-উদাস গলায় বললেন ডাক্তার তালুকদার, তোমরা কিছু খেলে-টেলে তবু মনে হবে এতজিনিসপত্তর, বাগান পোলট্রি কিছুটা সার্থক। তা নইলে সবই তো ওই ভূতভোজনে যায়।...উঃ, পাগলে যা খেতে পারে রে ভাই! এক একজনে পাঁচটা আস্ত মানুষের মতো খায়।

ট্যাপা হঠাৎ বলে ওঠে, অতো চাবুক খেলে আর বেশি খিদে হবে না?

ছেলেটাকে নেমকহারামই বলতে হবে। ডবল ডিমের খাতিরেও নরম হয় না?

ঘরে এসে মদনা বলল, এই ট্যাঁপা, তুই আবার ওই চাবুকের কথা তুলতে গেলি কেন? ঘুঘুবাবু বেশ স্তেঁহ-স্তঁহ ভাব দেখাচ্ছিল।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রে।

মুখটা তোর বড্ড ফসকায় ট্যাঁপা। একটা সেপটিপিন লাগিয়ে রাখার অব্যেস কর। নইলে বিপদ আছে।

তাই ভাবছি।

জগবন্ধুরও ওই চাবুকের কথা তোলার ব্যাপারে একটু সাবধান করে দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মহা বিপদ ওই নাম। নাম ধরে ডেকে উঠতে না পারলে জ্যাঠা বা মাতুলতুল্য ভাব দেখানো সম্ভব? অতএব পাশের ঘর থেকে বলে উঠলেন, এই, তোরা তৈরি হয়ে নে। একটু পরেই গাড়ি আসবে।

জগবন্ধুর অবশ্য এক্ষুনি আর পাগল দেখার উৎসাহ নেই। তবে ছেলে ছুটোর মুখ চেয়েই আপত্তি করেননি। এসেছে যে আশায়, তার এত সুযোগ জুটছে, আর জগবন্ধু সুযোগটা ছেড়ে দেবেন? তাছাড়া যত তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে কেটে পড়া যায়। একটা ভুতুড়ে জঙ্গলে বাগানের মধ্যে চারবেলা চর্বচোষ্য খাওয়া আর রাজকীয় ঘরে থাকা, এই কি ছুটিতে বেড়াতে আসার আদর্শ অবস্থা? ভেবেছেন ওই পাগলাখানাটা দেখা হয়ে গেলেই আগামীকাল কেটে পড়বেন।....

জগবন্ধুর নির্দেশে ট্যাঁপা মদনা তৈরি হতে শুরু করল। তৈরি হবার উপযুক্ত পোশাকের অভাব নেই, 'হোটেল বিউটি'তে থাকার সময়ই অনেক দোকানবাজার করা হয়েছে। আর হয়েছে শুধু ওদেরই জন্যে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে ট্যাঁপা! নীল ফুলপ্যাণ্ট, ক্রীম রঙের ফুল-হাতা শার্ট আর লাল হাতকাটা সোয়েটার পরে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ট্যাঁপা হঠাৎ কান্নার মতো ডুকরে ওঠে, মদনা! মদনা রে! এতখানি বয়সের মধ্যে জন্মে কোনোদিন জানি



নাই ট্যাঁপা দেখতে কেমন! তুই আমায় দেখেছিস, আমি তোরে। কেউ কারে বলি নাই, তুই তো দেখতে নেহাত মন্দ না। এখোন এই আয়নাখানা বলতেছে সে-কথা!

মদনা এবার বলে ওঠে, বুঝলাম আয়না তোকে সার্টিফিট দিচ্ছে। তা এবার একটু সরে দাঁড়া। আমায় তৈরি হতে দে।

ট্যাঁপা আর একবার ঘুরে-ফিরে মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখে নিয়ে সরে এসে একটু দুঃখু-দুঃখু গলায় বলে, পেটে যদি একটু বিদ্যের আঁচড় থাকত রে মদনা!

মদনাও নিজের ফুলপ্যান্ট ফুলশার্টপরা ফুল ফিগারটা দেখে মোহিত হয়ে বলে ওঠে, যা বলেছিস ট্যাঁপা। কে বলবে বাবুদের ঘরের পাশ-টাশ করা ছেলে নয়। শুধু ওই বিদ্যেতেই মেরেছে।

ট্যাঁপা একটু উদাসভাবে বলে, অ্যাখনো চেষ্টা করলে কিছুও হয় রে! বুদ্ধির তো অভাব নাই আমাদের!

।। ছয় ।।

গাড়ি এল।

সেই পুলিশ-গাড়ির মতো ভ্যান, আর বোবা ড্রাইভার। তা গাড়িতে ওঠার সময় সকলেই প্রায় বোবা।

গাড়ি চলছে একটু রুক্ষ প্রান্তর ঘেঁষে। হঠাৎ তালুকদার বলে ওঠেন, মেণ্টাল পেশেন্টদের জন্যে একটা ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট হয় জানো বোধহয় জগবন্ধু?

জানি। মানে শুনেছি। দেখিনি। শুনেছি খুব যন্ত্রণাদায়ক।

হুঁ! সেইটাকেই ওরা মাথা ফুটো করা বলে চেঁচাচ্ছিল। মাথায় ইলেকট্রিক চার্জ করতে হয় তো।

তালুকদারের এই হঠাৎ-কৈফিয়তটা কেমন খাপছাড়া লাগল। এমন-কী মুখ্যু ছেলে দুটোর কাছেও। আর দেখে অবাক হল, বোবা

ড্রাইভারটার মুখে যেন হঠাৎ একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল।

আচ্ছা, বোবারা কি শুধুই বোবা হয়? লোকে যে বলে বোবা-কালা। তার মানে বোবা থেকেই কালা অথবা কালা থেকেই—তবে? ওই হাসিটা কী করে? কেন?····

তালুকদার ল্যুনাটিক অ্যাসাইলামের ডাক্তার। বাজার-চলতি নাম পাগলাখানার ডাক্তার। এখানে ওঁর অবারিত দ্বার। এদের সঙ্গে করে নিয়ে-নিয়ে ঘুরতে লাগলেন ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে।

ওদিকটায় যাবার দরকার নেই জগবন্ধু! বললেন তালুকদার, ভিরুলেণ্ট টাইপের ওয়ার্ড। চোখে দেখা যায় না। তাছাড়া তুমি তো আবার—হাসলেন একটু, দারুণ ভিতু! তারপর বললেন, বরং নবাব-বাদশাদের ওয়ার্ড দেখবে এসো।

নবাব-বাদশা! এত নবাব-বাদশা—যে তাদের একটা ওয়ার্ড।

আরে এসো-না। নিয়ে চললেন খানিকটা।

ছোট-ছোট কটেজ-মতো, বাইরের বারান্দাটা গ্রিল-ঘেরা। তার মধ্যে একজনকে দেখা গেল। চমৎকার পোশাক-আশাক পরে বেতের চেয়ারে বসে এক সুকান্তি ভদ্রলোক বই পড়ছেন। কাছে টেবিলে ফুলদানিতে ফুল। এদের দেখেই বই মুড়ে রেখে হঠাৎ গ্রিলের কাছে চলে এসে অমায়িক হাসি হেসে বলে উঠলেন, এই যে এসে গেছেন? আসুন আসুন। ওরে কে আছিস! দরজাটা খুলে দে। এঁদের বসা। আর চায়ের ব্যবস্থা কর।

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বললেন, না না, ওসব থাক। আমরা এইমাত্র চা খেয়েই আসছি।

ওঃ। তবে থাক। বেশি চা খাওয়া ভাল নয়। লিভার নষ্ট হয়। তা বসবেন তো? সাহিত্য-টাহিত্য বোঝেন? একটু আলোচনা হোক। সাহিত্যে ঝোঁক আছে?

জগবন্ধু বললেন, সামান্য।

তা ওতেই চলবে। কাকে পছন্দ করেন? রবীন্দ্রনাথ না জীবনানন্দ? নাকি সুকান্ত? কিম্বা আরো আধুনিকদের? তা

ঢুকে আসুন। একটু জমিয়ে বসে—ওরে, দোরটা খুলে দে না।

জগবন্ধু নিচু গলায় বললেন, একেও কি তুমি পাগল বলবে তালুকদার?

তালুকদার বললেন, বলব কী হে! বলা তো হয়েই আছে।

শিক্ষিত ব্যক্তি তো নিশ্চয়?

নিশ্চয়। একটা ম্যাগাজিনের এডিটর ছিল লোকটা।

আমি বলছি ভদ্রলোক পাগল নয়! কোথাও তোমাদের ভুল আছে। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো।

ভুল তো আছেই। লোকটার মাথার মধ্যে! খোঁজ নিতে চাও চলো। রেকর্ড রুমে—

কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক হটাৎ দুটো হাত ঘুসি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন, এই শালা ভদ্দরলোক। তুইও ওই পাজি শয়তান ডাক্তারটার সঙ্গে গুজগুজ করছিস? ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব বলছি! আয় তো ঢুকে।

তীরবেগে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন জগবন্ধু কোম্পানী। আর পিছনে ছুটে আসে একটা হা-হা-হা-হা-হা হাসির শব্দ! ব্যাটা ভয় পেয়েছে।...হা হা হা!

এর পরও কি ডাক্তার তালুকদারের প্রতি সন্দেহ রাখা উচিত?

বাড়ি ফিরে জগবন্ধু ট্যাঁপাদের বললেন, কী রে, তোদের শখ মিটল? একসঙ্গে গাদা-গাদা পাগল দেখার?

ট্যাঁপা দুঃখের গলায় বলল, মিটল। তবে প্রাণে বড় দুঃখু জাগল মামাবাবু? অ্যাতো বুঝেও সবাইকে সত্যি পাগল মনে হয় না। সেই যে কলেজের ছেলের মতন ছেলেটা? বই হাতে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে পড়া মুখস্ত করছিল? বলল, কি—আপনারা বুঝি চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছেন?...তার কী-রকম হায়-হায় ভাব মুখ দেখেছিলেন?

জগবন্ধু বললেন, সত্যিই, এভাবে মজা দেখার মতো ওদের দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে এই ওয়ার্ডে। ডাক্তার যাকে ঠাট্টা

করে নবাব-বাদশার ওয়ার্ড বলল। এরা ভাল জামা-কাপড় পরে, ভাল বিছানায় শোয়, ভাল খেতে পায়, বই খাতা কলম পেন্সিল, পছন্দ-মতো শখের জিনিস সব পায়। কাজেই একেবারে অবোধ নয়। কী তুর্ভাগ্য।

মদনা হঠাৎ বলে ওঠে, আমাদের কেমন হল জানেন জ্যাঠাবাবু, একটা গপ্পোর সেই ভিখিরিটার মতন। গরিব ভিখিরিটা রোজ শিবমন্দিরের দরজায় বসে বর চায়, যাতে তার তুঃখু ঘোচে। তো একদিন শিবঠাকুর সদয় হয়ে মূর্তি ধরে এসে বললেন, বর দিতে এসেছি, কী বর চাই বল? ভিখিরিটা তুম করে বলে বসল, ঠাকুর, একদিন পেট ভরে মুড়ি খেতে চাই। টাটকা তাজা গরম মুড়ি! ....ঠাকুর হেসে বললেন; এই তোর প্রার্থনা? তো ভেবেচিন্তে আরও একটা বর চা! ....ভিখিরিটা বলল,—তবে বলি বাবা, মুড়ির সঙ্গে একটু নুন লঙ্কা আর খাঁটি সর্ষের তেল।....আমাদেরও সেই দশা! জন্মের মধ্যে কম্মো একটা দেশ বেড়ানোর বর জুটল, তো চেয়ে বসলাম রাঁচি যাব, গাদা-গাদা পাগল দেখব! কেন? বলতে পারতাম না তাজমোহোল দেখব? সুমুদ্দুর দেখব?

জগবন্ধু হেসে ফেলেন, খুব তো মজার গল্প-টল্প জানিসরে। তো সামনের ছুটিতে সমুদ্দুর, পরের ছুটিতে তাজমহল দেখা হবে! ওরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

ট্যাপা আর থাকতে পারে না। বলে ফেলে, তবে তো আপনাকেও পাগল বলতে হয় মামাবাবু! ফি ছুটিতে আপনি আমাদেরকে ঘাড়ে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, এইটা বলে বসলেন!

ঘাড়ে করে! হা হা করে হেসে ওঠেন জগবন্ধু, তোরা কি মালপত্তর? যে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে? হাসি থামিয়ে বললেন, রাঁচিরও আশেপাশে কত দেখবার জায়গা আছে। তু-তিন দিনে আর কতই হয়েছে! কাল এখান থেকে পালাই চল! কী বলিস? আবার হোটেল বিউটিতে—

মদন আর ট্যাপা তুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে, তাই ভাল! তাই

ভাল। সত্যি বলতে এখেনে তেমন সুখ পাচ্ছি না।

সত্যি, এখানে সুখ পাচ্ছে না ওরা।

তার মানে চারবেলা চর্ব্যচোষ্য খাওয়া, রাত্রে রাজকীয় বিছানায় শোওয়া, দাঁড়া-আয়নায় নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকা দেখতে পাওয়া—এ-সবের কিছুতেই সুখ নেই। সুখ একটা অন্য জিনিস।

কিন্তু কালকে এখান থেকে কেটে পড়ার কথা বলা হবে কাকে? যাঁকে বলবার কথা তিনি নিজেই তো কেটে পড়েছেন। সারাদিনে তাঁর দেখা নেই। অনবরত জীবনরামের বোদা-বোদা মুখখানি ছাখো, আর খাও-দাও!

তা ট্যাপা আর মদনা, অর্থাৎ চরণ পাল আর মোহন দাস, এরা তো আর শুয়ে-বসে থাকবার ছেলে নয়? তারা সারাদুপুর বাগানে ঘুরল, গাছপালা দেখল, গাছ থেকে আতা আর কলা পেড়ে খেল, পাগলাদের ব্যারাকেও উঁকি মারল। বোদামুখো জীবনরামকে বারবার ছলে-ছুতোয় ওদের দিকে নজর রাখতে আসতে দেখেও।

নিজেরা হাসাহাসি করল দুই বন্ধু, আমাদের খুব বোকা ভাবছে বুদ্ধুটা। আমরা যেন বুঝতে পারছি না, বারবার ওর বাগানে আসাটা ছুতো। লেবু কাঁচালঙ্কা শসা করলা, এসব এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত না?

যাকগে মরুকগে! কিছু বলতে আসতে তো পারবে না। মনিবের বন্ধুর ভাগ্নে ভাইপো!

আমরা একবার 'আবু হোসেন' সিনেমা দেখেছিলাম, তোর মনে আছে মদনা?

আছে। মনে পড়ছে। আমাদেরও সেই অবস্থা।

খানিক পরে বাগান থেকে সরে এল। শত ইচ্ছে সত্ত্বেও ছাতের ঘরখানা দেখবার উপায় নেই। সিঁড়ির দরজায় মস্ত একটা তালা। অথচ ওদের মনে হচ্ছে ওই ঘরখানার মধ্যেই যেন রহস্যের গন্ধ।

জগবন্ধু অবশ্য বন্ধু সম্পর্কে এখন খুব নিশ্চিন্ত। এখন তাঁর মতে

লোকটা শুধু ভালই নয়, মহান। না হলে ট্যাঁপা মদনাকে এত যত্ন-মান্য করে। আহা, কাজের দায়ে পাগল ঠ্যাঙাতে হয়, কী করবে! কিন্তু সারাদিনের মতো গেল কোথায় লোকটা? ডাক দিলেন, জীবনরাম! ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন?

জীবনরাম দুদিকে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ জানে না।

কিছুক্ষণ পরে, জীবনরাম, তোমার ডাক্তারবাবু গেছেন কোথায়?

জীবনরাম দুদিকে মাথা নাড়ে।

জীবনরাম, ডাক্তারবাবু সারাদিন খাওয়া-দাওয়া করলেন কোথায়?

জীবনরাম দুদিকে মাথা নাড়ে।

জীবনরাম, তোমার মনিব কি এ-রকম না বলে-কয়ে উধাও হয়ে যান?

জীবনরাম দুদিকে মাথা নাড়ে।

জীবনরাম, আমরা তো খুব মুশকিলে পড়লাম।

এখন জীবনরাম ওপর-নীচে মাথা নাড়ে।

জীবনরাম, তোমার মালিক কি আজ না আসতেও পারে?

জীবনরাম আবার দুদিকে মাথা নাড়ে।

জীবনরাম, ডাক্তারবাবু যদি আজ না ফেরে কী হবে? আমরা তো কাল সকালে চলে যাব ভাবছি।

এতক্ষণে জীবনরাম একটি বাক্য বলে। বলে, যাওয়া হবে না।

আমাদের কাজ আছে। জগবন্ধুর স্বর উত্তেজিত।

তথাপি জীবনরাম শান্ত নিশ্চিন্ত। শুধু রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তিতে হাতের চেটো দুটো ওলটায়। অর্থাৎ সে নিরুপায়।

হঠাৎ মদনা জোর গলায় বলে ওঠে, আর আমরা যদি জোর করে চলে যাই?

জীবনরামের মুখে একটু হাসির মতো ফুটে ওঠে। যে হাসির অর্থ—অসম্ভব। তারপর জীবনরাম খাবার টেবিল ঠিক করতে বসে। আশ্চর্য! টেবিলে খাবার দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে তালুকদারের নাটকীয় আবির্ভাব।

এই যে, সব রেডি! বাঃ বাঃ! জিতা রও বেটা জীবনরাম! আমি আসছি ভাই জগবন্ধু! দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। তোমরা বসে পড়ো।

মুখের চেহারায় লজ্জাশরমের বালাই নেই। রাত যে এগারোটা বাজে, সে-খেয়ালও নেই।

খেতে বসে তালুকদার বলে ওঠেন, এদের আগে খাইয়ে দিলে পারতিস জীবনরাম!

খেত কে? জগবন্ধু বললেন, তোমার উধাও হওয়া দেখে আমি তো ভাবলাম আজ খাব না! তো ছিলে কোথায় সারাদিন?

আর বলো কেন? একটা পেশেন্ট পালিয়েছে, তাই নিয়ে পাগলাখানায় হুলুস্থুলু। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে কত যে পেট্রল পুড়ল!

পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত?

নাঃ!

একটা লোক হেঁটে আর কতদূর যাবে?

সেই তো আশ্চর্য! যাকগে, সান্ত্রীরা বেরিয়েছে। আমি এই ফাঁকে তোমাদের একটা বেড়ানোর ব্যবস্থা করে এলাম।

আবার কী বেড়ানো? আমরা আবার ফিরেই যাই ভাই! পাগলাখানা তো দেখা হল।

পাগল! রাঁচি এসে কেউ নেতারহাট না দেখে ফিরে যায়? নেতারহাট ডাকবাংলোয় তোমাদের জন্যে ঘর বুক করে এলাম। বড় মনোরম জায়গা।

জগবন্ধু আর একবার মনে-মনে লজ্জিত হলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, তুমি এলে কোন দিক দিয়ে? গাড়ির শব্দ পেলাম না!

আকাশ থেকে পড়লাম। হেসে উঠলেন ডাক্তার। আচ্ছা গুড নাইট! তা হলে সকালবেলাই বেরিয়ে পড়া যাবে। ওখানেই লাঞ্চের ব্যবস্থা। ওহে ভাগ্নে ভাইপো, খুব ভোরে উঠে রেডি হবে।

জগবন্ধু—

আমায় আর বলতে হবে না।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখব?

কোনো দরকার নেই। আমি এই একটি ঘুমে রাত কাবার করে সাড়ে-চারটেয় উঠে পড়ব।

আরে অত কিছু না। পাঁচটায় উঠলেও হবে।

চলে যান তালুকদার তাঁর অজ্ঞাত বেডরুমের উদ্দেশ্যে।

॥ সাত ॥

কিন্তু আজকেই যে জগবন্ধুর কী হল? এক ঘুমে রাত কাবার কোথায়? মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিচ্ছিরি একটা কুকুর না শেয়াল কিসের কান্নায়। এত অনাছিষ্টি জন্তু-জানোয়ারও পোষার শখ তালুকদারের। ওর জঙ্গলের বাগানের ও পাশে নাকি একটা চিড়িয়াখানা আছে। তাতে বুনো শেয়াল, বুনো কুকুর, উদ্‌বিড়াল, বেজি, গোসাপ, চিল, দাঁড়কাক এই সব প্রাণীর বসবাস।

প্রথম দিনেই ঐ গল্প বলেছেন ডাক্তার।

ট্যাঁপা বলে বসেছিল, এ মা! এ-সব আবার পোষে নাকি?

ডাক্তার তালুকদার উদার গলায় বলেছিলেন, কেউ পোষে না বলেই তো! ওরা তো কোনোদিন মানুষের ভালবাসা পায় না। এখানে পাচ্ছে।

শুনে জগবন্ধুর ভাল লেগেছিল। কিন্তু এখন মাঝরাত্রে বুনো শেয়ালের ডুকরে-ডুকরে কান্না শুনে প্রাণ যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর বাবা! ঠিক যেন মানুষে কাঁদছে ডুকরে-ডুকরে। এও মানুষের পুষতে ইচ্ছে করে? ভাবলেন জগবন্ধু বোস। এমনিতে তো সারাটা দিন না-পোষা বানরের হুপহাপ শব্দ। সকালে পাগলের ট্রিটমেন্টের ভয়াবহতা, আবার মাঝরাত্তিরে শখের চিড়িয়াখানার বুনো প্রাণীর আর্তনাদ। লোকটা নিজে যে কেন এখনো পাগলের খাতায় নাম লেখায়নি।

জগবন্ধু উঠলেন, জল খেলেন, কানের ওপর কম্বল চাপা দিলেন, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। শব্দটা থামতেই হয়তো।

ঘুম ভাঙল একেবারে পাঁচটা বেজে যাবার পর। খুবই লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে দেখেন সামনেই তালুকদার।

জগবন্ধু বলে উঠলেন, আর বোলো না ভাই, কাল অহঙ্কার করলাম, আর আজকেই দেরি। তা কাল ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়েছে। মাঝরাত্তিরে সে এক বিশ্রী ব্যাপার।

তালুকদার চমকে ওঠেন। খুব চমকে। তারপর আস্তে বলেন, কী ব্যাপার?

আরে বাবা, তোমার পোষা প্রাণীদের মধ্যে বুনো কুকুর না বুনো শেয়াল, কে জানে কোন মহাত্মা, এইসা কান্না জুড়ে দিয়েছিল! উঃ! কে বলবে জানোয়ারের গলা। যেন মানুষের আর্তনাদ! তুমি শুনতে পাওনি?

তালুকদার অবহেলার গলায় বলেন, ওঃ! এই ব্যাপার! ও তো রোজই শুনি। রোজই কাঁদে।

কিন্তু কাঁদে কেন? খেতে-টেতে তো পায়!

তালুকদার গম্ভীর হন। খেতে পেলেই কি সব হল? বন্য প্রাণীদেরও সুখ দুঃখ আহ্লাদকষ্ট হাসি কান্না থাকে হে। সেটাই স্টাডি করি!

জগবন্ধু বললেন, শখ বটে! তারপর বলে উঠলেন, মহাপুরুষরা তৈরি হয়ে নিয়েছেন?

আবারও সেই নামের সমস্যা। তাই মহাপুরুষরা বলা।

কিন্তু তারা কারা তালুকদারের বুঝতে আটকায় না। বলে ওঠেন, কই, তাদের তো টিকিও দেখিনি। ঘুমোচ্ছে বোধহয়।

সে কী! ছি ছি। আজ সবাই ফেলিওর!

জগবন্ধু ছেলেদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভেজানো দরজাটা আস্তে ঠেললেন। দেখলেন দুটি নাইলনের মশারি ফেলা খাটে, দুই মহাত্মা তখনো কম্বল চাপা দিয়ে নিদ্রাগত!

জগবন্ধু বেশ কয়েকবার ডাকলেন, এই এই করে, নো নড়ন চড়ন। তাড়াতাড়ি নোটবুকটা নিয়ে এসে খুলে ধরে জোর গলায় হাঁক পাড়লেন, চরণ পাল। মোহন দাস।

কিন্তু নো সাড়া।

ও চরণ! চরণ! ওহে মোহন! মোহন!

তালুকদার অমায়িক ভঙ্গিতে বলেন, থাক থাক, আর-একটু ঘুমোক না-হয়। বেশি রাতে শুয়েছে—ছেলেমানুষ! ট্রেনের সময় তো নয়। বাই কার যাওয়া!

জগবন্ধু লজ্জিত গলায় বললেন, ওদেরও বোধহয় আমার মতো ঘুমের ডিস্টার্ব হয়েছে! না হলে-

ডিস্টার্ব! তা হতে পারে।

কিন্তু কত হয়েছে? ঘড়ির কাঁটা যে অনেকখানি এগিয়ে গেল। তালুকদার বললেন, জীবনরাম, এবার তো দাদাবাবুদের ডাকতে হয়। নাড়া দিয়ে বল গাড়ি এসে গেছে।

সত্যিই এসে গেছে দেখা যাচ্ছে। সেই গাড়ি! তালুকদারের ব্যবস্থা নির্ভুল।

জীবনরাম হাতের ঝাড়নটা কাঁধে ফেলে ধীরেসুস্থে ঘরে ঢুকে একজনের মশারি তোলে। কম্বল তোলে, তুলেই আঁক্ করে ওঠে।

এই আঁক্ শুনেই জগবন্ধু ছুটে চলে আসেন। কী ব্যাপার। কী হয়েছে?

ততক্ষণে দ্বিতীয় মশারি কম্বল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাখি পলাতক! না না, প্রাণপাখি নয়, পুরো বডিটাই! দুটি খাটে দুটি মশারির মধ্যে দুখানি কম্বল চাপা দেওয়া দুটি পাশবালিশ, যাদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা ঘুমোচ্ছে।

তালুকদার বললেন, এর মানে?

জগবন্ধু বললেন, আমারও তো সেই প্রশ্ন। এর মানে?

তোমার আপনজন, তুমি ওদের মতিগতি জানো ভাই। ওদের কি নেতারহাট যেতে ইচ্ছে ছিল না?

বেচারী জগবন্ধু বোস! তাঁর আপনজনেদের মতিগতি কতটুকুই বা জানেন তিনি? শুকনো মুখে বলেন, অনিচ্ছে আর কী? বলছিল, নেতারহাট আবার কী জায়গা! হোটেল বিউটিতে ফিরে গেলেই হত!

শুধু এই? এইজন্যে এভাবে সকলকে ধাপ্পা দিয়ে পালিয়ে যাবে? না না, এ একেবারে অমার্জনীয় জগবন্ধু। বললেই তো পারত। অকারণ কতকগুলো টাকা খরচা করে, ঝামেলা সয়ে ডাকবাংলো বুক করে এলাম। গাড়িটার পেটে ঠেসে তেল ভরিয়ে রাখলাম—

মরমে মরে গেলেন জগবন্ধু। কিন্তু হতভাগা দুটো যাবে কোথায়? পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাবে?

তালুকদার বললেন, তা বলা শক্ত। কালকের পাগলটা তো ভাগল। দাড়িগোঁফের জঙ্গল নিয়ে, ওই পোশাকে কোথায় যে ঘুরছে! এরা তো তবু সুটেড বুটেড!

হোক সুটেড বুটেড। দুটো কমবয়সী মুখ্যু ছেলে বৈ তো নয়। এখানের কিছুই জানে না অথচ স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল। কী দুশ্চিন্তা! জগবন্ধু তো ওদের বিষয় কিছুই জানেন না।

হাওয়াই। কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নেই ছেলেদুটোর। কিন্তু খুঁজতে তো হবে। গাড়ি নিয়ে বেরোনো ছাড়া উপায় কী?

সারাটা দিন এখানে-ওখানে টহল মেরে, অবশেষে রাঁচি শহরে পৌঁছে গিয়ে সন্ধের মুখে সেই হোটেল বিউটি।

জগবন্ধুর মন নিচ্ছে এখানেই এসে হাজির হয়েছে ছেলে দুটো। এই জায়গাটাই বেশ পছন্দ হয়েছিল তাদের। ····কী জানি গতরাত্রে শেয়ালের কান্নায় ভয়-টয় পেয়ে—। কিন্তু জগবন্ধুকে বলে যাবে না? মনে বড় ধাক্কা লাগছে। ওরা যে জগবন্ধুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে ভাবা যায়?

দি হোটেল বিউটি। সেই গেট! সেই গণেশ-বসানো কুলুঙ্গির নীচে দরজা। সেই সামনের ঘরে ঢুকেই রিসেপশান-রুম, সেই কাউন্টারে গুঁফো নস্করবাবু। প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে প্রায় চেয়ার ছেড়ে

দাঁড়িয়ে উঠলেন গুঁফো। এখানে! আমার এখানে? দুদিন পাগলা গারদের পাড়ায় বাস করে এসে আপনিও কি পাগলা বনে গেলেন প্রফেসর বোস। আপনি রইলেন সেখানে, আর আপনার ছেলেরা এসে যাবে এখানে? কেন, সেখানে ভীষণ কিছু অসুবিধে হচ্ছিল ওদের?

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সে কী! অসুবিধে কী? এত আরামে ব্যাটারা, জীবনে কখনো থেকেছে? চোখেই দেখেনি।

তালুকদার গম্ভীরভাবে বলেন, হচ্ছিল নিশ্চয় কিছু অসুবিধে। নচেৎ পালাবে কেন?

না না, ও-কথা নয়। আসলে হয়তো ভয়-টয় পেয়ে—.

গুঁফো নস্করমশাই বলে ওঠেন, ভয় পেয়ে মানে? কিসের ভয়?

না না, তেমন কিছু না। রাত্রে বুনো জানোয়ারের ডাক-টাক শুনে হয়তো—

ও হো-হো! নস্করবাবু বললেন, ডাক্তারবাবুর চিড়িয়াখানার ব্যাপার? তা মিথ্যে বলব না মশাই, ভয়াবহই। ছিলাম তো একবার দিন-দুই। বন্য জন্তুর কান্না! উঃ সাংঘাতিক! কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ে কেউ মাঝরাত্তিরে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরোয়? তা-ও অজানা অচেনা জায়গায়? আপনি যা বলছেন, তাতে মনে হয় ওরা দুটোতে আদৌ শোয়ইনি। যুক্তি করে বালিসে কম্বল চাপা দিয়ে তখনই পালিয়েছে। ভয় পেলে আপনার ঘরেই পালিয়ে আসত।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু পালাবে কেন? সে কেন-র উত্তর জগবন্ধুই জানেন। তাঁরই ভাগ্নে-ভাইপো।····

ওদের সেই ছ' নম্বর ঘরটা একবার দেখুন-না মিস্টার নস্কর। আমি তো ঘর ছেড়ে দিয়ে যাইনি।

আহা। সে ঘরে তো তদবধি তালামারাই আছে। বেশ, আপনি যখন বলছেন, চলুন।

গেলেন।

তালা খোলা হল। শূন্য ঘরখানা যেন দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

তারপর জগবন্ধুর ঘরটাও দেখা হল। একই অবস্থা।

নস্করবাবু বললেন, ইচ্ছে করে আপনি আনলাকি থার্টিনটা নিলেন মশাই। পেলেন তো ফল ?

বলার কিছু নেই।

কোনো বাজে ছেলেপেলের সঙ্গে জুটে যায়নি তো ?

কী আশ্চর্য। সব সময় তো আমার সঙ্গে !

তা হলে কলকাতায় পিটটান দিয়েছে।

দিলেই হল ? জগবন্ধু উত্তেজিত, ট্রেনের ভাড়া আছে ওদের কাছে ?

ট্রেন-ভাড়ার টাকা নেই ! আপনি যে হাসালেন মশাই ! ভাড়ার টাকা নেই বলে রেলগাড়ি যাবে না ? বিনা টিকিটের যাত্রী কথাটা তবে ডিক্সনারিতে আছে কেন ? নিশ্চিন্ত থাকুন, কলকাতাতেই চলে গেছে। বাড়িতে আছে কে আপনার ?

তালুকদার বলে ওঠেন, কে আর ? একটি পুরাতন ভৃত্য। সংসার বলতে তো কিছুই নেই। ওই লোকটাই সব।

তো তাকেই একটা টেলিগ্রাম--ইয়ে বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

তা আছে।

ব্যস ! ব্যস ! চট করে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করে ফেলুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেয়ে যাবেন, ঠিক শুনবেন মূর্তিমানেরা বাড়ি পৌঁছে গেছেন।

জগবন্ধু আলগা গলায় বলে ফেলেন, তা সে-বাড়িটা তো আর ওদের বাড়ি নয় ? ওখানে যাবে কেন ?

ও হো-হো ! ওরা তো আপনার ছেলে নয়, ভাগ্নে-ভাইপো। তো ওদের কারো বাড়ির ঠিকানাতেই একটা টেলিগ্রাম ছেড়ে দিন। নয় তো বলুন, চটপট আমিই ট্রাঙ্ক টেলি করে দিচ্ছি। যার হোক ঠিকানা, আপনার ভাইয়ের বাড়ির, কিংবা বোনের বাড়ির—

জগবন্ধুর মনে হল লোকটা যেন মজা দেখছে। খুব রেগে গেলেন। বলে ফেললেন, কস্মিনকালে আমার কোনো ভাই-বোন নেই। ছিলও না।

অ্যাঁ। বলেন কী মশাই? তা হলে ভাগ্নে-ভাইপো আসে কোথা থেকে?

আকাশ থেকে। ওরা এমনি, কুড়িয়ে পাওয়া। কদিন আগেও চিনতাম না।

সর্বনাশ! নস্কর বলে ওঠেন, ও ডাক্তারবাবু, এ-ভদ্রলোক বলেন কী? অ্যাঁ! ওনারা আপনার ঘর থেকে কিছু মালপত্র হাতিয়ে হাওয়া হয়ে যাননি তো?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, কী যে বলেন।

ঠিকই বলছি। যান যান! দেখুন গে চটপট! অ্যাঁ! দুটো অজানা অচেনা ছেলেকে আপনি কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন প্রফেসর বোস? ব্যাপার কী?

আমার খুশি! খুব রেগে গেছেন জগবন্ধু বোস।

কিন্তু খুশি বললেই তো হল না। সাত বায়নাক্কা করতে বসেন নস্কর। ব্যাপারটা নাকি দারুণ ঘোরালো। দুটো অজানা অচেনা ছেলেকে আত্মীয় সাজিয়ে মানে পরিচয় দিয়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আতিথ্যের সুযোগ নেওয়া, এসব ঘোরতর বে-আইনি। আর সেই ছেলেরা রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেল? বোঝাই যাচ্ছে কেমন ছেলে।

নস্করের মতে এ আর কিছুই নয়, সবটাই ওই ঘুঘু ছেলে দুটোর কারসাজি। নির্ঘাত এই রাঁচির দিকে ওদের গ্যাঙ আছে, তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই বোকাসোকা ভালমানুষ প্রফেসরের স্কন্ধে ভর করে চলে এল। ছুতো কী? না, অনেক পাগল দেখব। পাগল না হলে কেউ এ-হেন কথা বিশ্বাস করে? এখন ডাক্তার তালুকদারের সত্যিই উচিত, পুলিশের ডায়েরী করে রাখা।

ডাক্তার অবশ্য এ-কথা কানে নেন না। বলেন, ও-সব ঝামেলার কথা থাক। ছেলে দুটি সে-রকম নয়। কী খেয়ালে, কী করে বসেছে। জগবন্ধু, আমার তো ভাই আর সময় নেই, ফিরে যেতে হচ্ছে। ডিউটি রয়েছে। তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে খুঁজে বেড়াও।

দোকানে বাজারে, যে-সব জায়গায় নিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ, সেইসব চেনা জায়গায়—রেলওয়ে স্টেশনেও—মিস্টার নস্কর, আপনার লোকজনকে বলুন এঁদের স্যুটকেস তিনটে আমার গাড়ি থেকে নামিয়ে নিতে।···প্রফেসর, কী আর বলব! খবর পেলে আমায় একটু জানিও। অত্যন্ত দুঃখিত মন নিয়ে চলে যাচ্ছি।

তুমি চলে যাচ্ছ? ভারী অসহায় লাগে জগবন্ধু বোসের গলার স্বর।

কী করব ভাই, উপায় নেই। নইলে তোমায় এই অসুবিধের মধ্যে ফেলে—মিস্টার নস্কর যাই বলুন, ছেলে দুটির ওপর আমার কোনো সন্দেহ আসছে না। ভারী মায়া পড়ে গিয়েছিল। খুব আমুদে। কেন যে এমন করল। দিনের বেলা রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে গেলে তবু মনে হয় কোনো বদ লোকের পাল্লায় পড়ে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু এটা দুর্বোধ্য! রীতিমত পরিকল্পিত ব্যাপার। ভেবে পাচ্ছি না এ-রকম করবে কেন? খুব খারাপ লাগছে—বিশেষ করে আমার বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল। ডাক্তার তালুকদার দুঃখে ভেঙে পড়েন।

তখন আবার জগবন্ধুকেই সান্ত্বনা দিতে হয়, বলতেই হয়—তোমার কী দোষ?

আমিই তোমাদের টেনে নিয়ে গেলাম।

তাতে তো ওরা খুশিই হয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে রাঁচিতে আসা, সেটা সফল হল। তবে মনে হয়, হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে এ-রকম করে বসেছে। হয়তো একত্রে অনেক পাগল-টাগল দেখে নার্ভটা ঠিক ইয়ে ছিল না।

গুঁফো নস্কর বলে ওঠেন, নার্ভ বিগড়োলে কি আর কেউ এমন কলাকৌশল করে চম্পট দেয় মশাই? ছেলে দুটি ঘুঘু!

আপনি থামবেন? ডাক্তার তালুকদার গুঁফোর চোখে একটু চোখ রেখে বলেন, দেখছেন ভদ্রলোক কাতর হয়েছেন।···বরং দেখুন যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন।



নস্কর ঠোঁট উলটোলেন, বাচ্চা নয় যে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে, সেকাল নয় যে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, সাহায্য আর কী করতে পারি বলুন ?

তালুকদার চলে গেলেন।

জগবন্ধু ভেবে পাচ্ছেন না কোন পথ ধরে খুঁজতে বেরোবেন ? তবু স্থির হয়ে তো থাকতে পারেন না ? দরকার হলে প্লেনে চড়ে কলকাতায় চলে গিয়েও খুঁজতে হবে।....আমি কি মানুষ চিনতে ভুল করলাম ? অসম্ভব।....কী একটা রহস্যজালে ঘিরে ফেলছে যেন।....আমার ঠাকুমা বলতেন, জানোয়ারের কান্না খুব অপয়া। শুনে আমি হাসতাম, এখন দেখছি সত্যি।....ওরে ছেলে তুটো, একবার এসে পড়ে বাবা !

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ওরা হাজারিবাগে ছিন্নমস্তার মন্দির বেড়াতে চলে গেছে। সেদিন যাবার কথা হয়েছিল। অথবা ওই সেই নেতারহাটেই চলে গেছে আগে-ভাগে। আমাদের সারপ্রাইজ দেবার জন্যে। নয়তো টাটায় যাবার মতলব করেনি তো ? কিম্বা—

অনেক কিংবা ভাবতে গিয়ে জগবন্ধুর মনে পড়ে গেল ওদের হাতে টাকাকড়ি নেই। কোন কিংবাটা এমনি ফাঁকা হাতে হবে ? হায়, হায়, কিছু টাকা ওদের হাতে কেন দিয়ে রাখিনি আমি। দেওয়া উচিত ছিল।

দিন তিন-চার ধরে শুধু ছুটোছুটি করে বেড়ালেন জগবন্ধু, আর যেখানে যাকে পান ধরে-ধরে বিবরণ দিতে লাগলেন, এই ধরনের তুটো ছেলেকে কেউ দেখেছে কিনা।

কেউ বলে না— দেখেছি।

টাটায় নয়, হাজারিবাগে নয়, এমনকি পুরুলিয়া পর্যন্ত গেলেন। ভাবলেন ডাক্তারের মুখে পুরুলিয়া শুনে যদি চলে গিয়ে থাকে। নস্কর বলেছে, এক পয়সা হাতে না নিয়েও গোটা ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করা যায়। এমন মজার দেশ এটি।....

লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন কলকাতায় সাধনকে ট্রাঙ্ককল

করলেন। তুই কেমন আছিস-টাছিস? বলে আসল কথা পাড়লেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সাধন লাইনের ওধারে চেঁচিয়ে উঠল, ভেগেছে তো? ঠিক হয়েছে। জানি ভাগবে। তা কী-কী নিয়ে ভেগেছে? তোমার ঘড়ি আংটি মনিব্যাগ শাল র‍্যাপার কোট—সব?

আঃ! কী বাজে বকছিস?

তা তো বলবেই। তা কিছু হাতালেই তুমি টের পাবে? আর টের পেলেও স্বীকার পাবে? যাক, খুব বেড়ানো হয়েছে, এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো। খুন হওনি এই ঢের। এখন বুঝতে পারছ, মানিকজোড় কোনো মতলব ভেঁজেই তোমার ল্যাজ ধরেছিল। নির্ঘাত তুকতাক করেছিল তোমায়। নইলে দুটো চোর-ছ্যাচোড়কে নিয়ে নিয়ে জামাই-আদর! আমি এই বলে রাখছি দাদাবাবু—

কেটে গেল লাইন। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

।। আট ।।

অনেকক্ষণ ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে ট্যাঁপার যখন ঘুম ভাঙল, মদনা তখনো ঘুমোচ্ছে। ট্যাঁপা দেখতে পেল মদনার গায়ে একটা চাদর চাপা। কিন্তু এ কোথায় তারা? সেই রাজসই ঘরদোর আসবাবপত্র, সুখের সাগরে ডোবা বিছানা, সে-সব কই? লম্বা একটা ঘরের মধ্যে মেঝেয় শতরঞ্চি পাতা, না বালিশ না কিছু, একধারে ট্যাঁপা শুয়ে আছে, আর ওধারে মদনা। ট্যাঁপার গায়েও বোধহয় একটা চাদর ছিল, সেটা পায়ের কাছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে আছে।

ট্যাঁপার মনে হল এটা নিশ্চয় স্বপ্ন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে বসল। চারিদিক তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী ঘটেছে? এ-কখন শুতে এল তারা? এই ছোট-ছোট জানলাওয়ালা, বিশ্রী খসখসে শানের মেঝের ঘরটা এদের ছিল কোথায়? জানলাগুলো সব আটকাঠ বন্ধ। এখন সকাল, না দুপুর,

না বিকেল? তবে রাত্রি নয়, দিন এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কারণ ওই জানলাগুলোর খাঁজে-খাঁজে একটু ফাঁক আছে, তা দিয়ে সরু-সরু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কী অবাক কাণ্ড রে বাবা! রাতারাতি কি ভুতে উড়িয়ে নিয়ে এল?

ট্যাঁপা ভয়ে-ভয়ে খুব আস্তে ডাকল, মদনা!

সাড়া পেল না।

আরো ভয় পেয়ে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মদনার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, মদনা! মদনা রে!

মদনা আস্তে চোখ খুলে, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করে থাকার ইশারা করল।

তুই জেগে আছিস? ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল ট্যাঁপা।

মদনা সেইভাবেই বলল, অনেকক্ষণ।

কাণ্ডটা কী বল তো? আমরা কোথায়?

সেই ছাতের ঘরটায়।

অ্যাঁ! তাই বুঝি? কিন্তু কী করে এলাম?

ব্যাপার আছে কিছু।

আমাদের কি গুম করেছে?

তাই মনে হচ্ছে।

কী হবে?

দেখা যাক। এই, আবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড় চুপচাপ। কোথায় যেন একটা শব্দ হল।

চটপট চাদর ঢাকা দিয়ে ঘাড় গুঁজে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে দুজনে।

একটু পরেই অদ্ভুতভাবে একটা লোক ঘরে ঢুকল। ঘরের দরজা খুলে নয়, এল একটা জানলার পাল্লা খুলে। ওই পাল্লাটার সঙ্গেই জানলার গ্রিলটা আঁটা। কাজেই বন্ধ থাকলে বোঝা যায় না, ফাঁকা। যদিও ছোট্ট জানলা, তবু লোকটা বেশ সুকৌশলেই ঢুকে এল, এবং উঁচু দেয়াল থেকে সাবধানে নিঃশব্দে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে, ফাঁকা জানলা দিয়ে একটা দড়ির মই উঠিয়ে নিয়ে জানলাটা আবার জোরে

চেপে বন্ধ করে দিল। তার মানে লক্ হয়ে গেল। ওদিক থেকে চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।

অঘোরে ঘুমের মধ্যে তো আর চোখ পিটপিট করা যায় না! কাজেই এ দৃশ্যটা দেখতে পেল না ওরা। তবু যেন আন্দাজে ধরতে পারল।

লোকটা কিছুক্ষণ ওদের শতরঞ্চির ধারে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হঠাৎ বিচ্ছিরি গলায় বলে উঠল, এই শুয়োররা: এখনো ঘুমোচ্ছিস, না মটকা মেরে পড়ে আছিস?

শুয়োররা শুনে রাগে মাথা জ্বলে গেলেও, অঘোর ঘুমের মধ্যে তো আর তেড়ে ওঠা যায় না?

লোকটা পা দিয়ে ওদের গায়ে একটু আস্তে করে ঠোক্কর দিয়ে বলল, এই শয়তানের ছানারা, বেঁচে আছিস না মরে গেছিস?

ওরা নিথর।

গায়ে পা ঠেকানোর শোধ সুযোগ পেলে নেবে। এখন ধরে নিচ্ছে তারা মড়া।

ট্যাঁপা সব সময় মদনকে গুরুর আসন দিয়ে থাকে। ও ততক্ষণই বোজা চোখ আর গোঁজা ঘাড় নিয়ে মড়ার পার্ট প্লে করে যাবে যতক্ষণ না মদনার গলা থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাবে।

লোকটা আর একবার আর একটু জোর ঠোক্কর দিয়ে বলে উঠল, এই উল্লুকরা, উঠবি কি উঠবি না?

কিন্তু ওরা ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে আছে। সাহস করে আছে, কারণ বুঝতে পারছে, রাত্রে তাদের এমন কোনো-কিছু খাওয়ানো হয়েছিল, যাতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এখনো চোখে এমন ঘুম জড়িয়ে আছে, যে মনে হচ্ছে এভাবে চোখ বুজে পড়ে থাকলে আবার সত্যিই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

লোকটা এখন বিড়বিড় করে বলল, বেকুব জীবনরামটা হেভিডোজ দিয়ে বসেনি তো! তবেই তো গেছি। লাশ পাচার করতে তো এই হাড়হাভাতে করালী!—ধুস। বলে লোকটা সরে গেল। যাবার

সময় মাটিতে ফেলে রাখা দড়ির মইটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

বেচারি মড়ারা! চোখ না খুলে যদি নাক-কান দিয়ে দেখা যেত। তা ও তুটো যন্ত্রকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে যা হয়।

বুঝতে পারল লোকটা আর ঘরে নেই।

মদনই আস্তে চোখ পিটপিট করে দেখল। না সত্যিই নেই। কিন্তু গেল কোন্‌দিক দিয়ে? দরজা খোলার শব্দ তো পেল না।

একটু পরে ট্যাপাও চোখের কোণটা ফাঁক করল। আর এই সময় তারা একটা মৃদু একটানা ইলেকট্রিক মেশিন চলার মতো শব্দ শুনতে পেল। কলকাতায় এক-একটা খাবারের দোকানে, ঠাণ্ডা আলমারি চলার সময় এ-রকম শব্দ হয় যেন, দেখেছে ওরা।

এদেরই তাহলে কোথাও ঠাণ্ডা আলমারি আছে? কানটা আরো খাড়া করল। কিন্তু এ কী? ওই শব্দের সঙ্গে মানুষের গোঙানির মতো একটা শব্দ হচ্ছে কেন?

লোকটা কোন্ দিক দিয়েই বা হাওয়া হয়ে গেল?

কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে অস্থিরতা এল। গোঙানিটা যেন বাড়ছে। তার সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ আসছে, অনেকটা হাসপাতালের বাড়ির মতো।

মদনা আস্তে বলল, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

ট্যাপা ঘাড় নাড়িয়ে বলল, হুঁ।

দেখতে হচ্ছে। যা থাকে কপালে। উঠে পড়ল মদনা।

অতএব ট্যাপাও।

দাঁড়িয়ে উঠে একটা দরজা দেখতে পেল, সাহসে ভর করে একটু ঠেলতেই অবাক, আরে, এখানে একটা বাথরুম। বেসিন জলের ট্যাপ ইত্যাদি সবই রয়েছে।

তার মানে ঘরটা কারাগার।

মদনা বলল, বন্দী করে রাখলেও তাদের চান-টান তো করতে হবে। আচ্ছা আসছি ঘুরে, জানা রইল।

বলে সরে এসে দেখে—এ আবার কী, এতক্ষণ লক্ষ্য পড়েনি,

ঘরের মধ্যেই একটা খিলানের মতো জায়গার খাঁজে চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি।

যা থাকে কপালে বলে কটা উঠল। উঠেই দেখল একটা প্যাসেজ, সেটা ডান দিকে ঘুরে গেছে। তার মানে 'এল' শেপ। এবং ওদিকটা একটু উঁচুতে অবস্থিত।

ওইদিক থেকেই শব্দটা বেশি আসছে। মেশিনের সঙ্গে মানুষের গোঙানির। মদনা সেদিকে এগোল।

মদনা! ট্যাঁপা কাতরভাবে ওর জামা খিমচে ধরে বলে, মদনা, মরবি?

মদনা বলল, যা দেখছি, মরণ কপালে নাচছে। তো মরার পূর্বে দেখে যাই শেষমেশ?

সরু প্যাসেজ, অন্ধকারে ডোবা। কোনোদিক থেকেই আলো আসার বালাই নেই। পা বুলিয়ে-বুলিয়ে যেতে-যেতে আর-একটা বাঁক, সেখানে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেল কালো পর্দা ঝোলানো একটা কাচের পাল্লাদার দরজা। পর্দাটা একটু সরাল। দেখল দরজার ওপারে যে-ঘরটা রয়েছে, তার মধ্যে আলো জ্বলছে। বাল্‌ব বা টিউব কিছু দেখতে পেল না, তবে ঘরটা আলোয় ভরা, হালকা নীলরঙা আলো। সেই ঘরে স্রেফ হাসপাতালের ঘরের মতোই দৃশ্য! একটা সরু খাটে একটা লোক শুয়ে আছে, খাটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, মুখটাও একটা সাদা কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা। যেমন অপারেশন করবার সময় ডাক্তাররা বাঁধে। সিনেমায় দেখেছে ট্যাঁপারা। ঘরে কোনো লোক নেই।

পর্দাফেলা বন্ধ কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারল মদনা, গোঙানিটা ওই বাঁধা মুখ থেকেই বেরোচ্ছে। এবং এও বুঝতে পারল, মেশিনের শব্দ আর ওই শব্দটা কম শোনাচ্ছে কাচের মধ্যে থেকে বলে। নয়তো বোধহয় বেশ জোরালোই।

আস্তে-অস্তে ঘরের মধ্যেটা সব চোখে পড়ছে। রুগীটার মাথায় কেমন যেন একটা ঝকঝকে ফ্রেম ফিট করা, সঙ্গে চকচকে ঝকঝকে

আরো কী-সব যন্ত্রপাতি, মাথার কাছে একটা টুলের ওপর বসানো।

একটু পরে গোঙানির শব্দটা থেমে গেল, ক্ষণপরেই মেশিন-চলা শব্দটাও। কেউ কোথাও নেই, সুইচ নেভাল কে ? কোনো অদৃশ্য-লোক থেকেই কাজকর্ম চলছে তাহলে ?

ওদিকে কাচের ওপারে অদ্ভুত দৃশ্য। এদিকে পর্দার একটু কোণ সরিয়ে ছুটো ছেলে পাথরের পুতুলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ক্রমশই যা দেখতে পাচ্ছে, তাতে সত্যিই পাথর হয়ে যাবে না তো ?

কী দেখতে পেল ট্যাপা-মদনা ? দেখতে পেল ঘরের এক দিকের দেয়াল আস্তে-আস্তে সরতে লাগল। আরো, আরো। ব্যাস, খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, দেখা গেল সেখান দিয়ে একটা, বোধহয় কাঠেরই হবে, সিঁড়ি নেমে গেছে সেই সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে আসছেন ডাক্তার তালুকদার। গলায় স্টেথস্কোপ ঝোলানো।

॥ নয় ॥

হোটেল বিউটির নস্করবাবু বললেন, কলকাতাতেই যদি চলে যাচ্ছেন প্রফেসর বোস, মিছিমিছি আর আমার হোটেলের ঘর আটকে রেখে যাচ্ছেন কেন ?

জগবন্ধুর ক'দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে উদভ্রান্ত অবস্থা, তিনি বিরক্ত গলায় বলেন, তাতে আপনার লোকসানটা কী মিস্টার নস্কর ? এক সপ্তাহের পুরো চার্জ অ্যাডভান্স দিয়ে যাচ্ছি, অথচ আপনার বোর্ডারের জন্যে কোনো খরচ হচ্ছে না।

আহা, তাহলেও মানে····

মানের কিছু নেই। আটকে রেখে যাচ্ছি তো ওই অপয়া তেরো নম্বরটা। ওটা আপনার সহজে ভাড়া হয় না।

কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে জগবন্ধুকে ছুটো কারণে। এক হচ্ছে —টাকা ফুরিয়ে গেছে, কলকাতায় না গেলে টাকার ব্যবস্থা হবে না।

দুই হচ্ছে—সত্যিই যদি ছেলে দুটো কলকাতায় ফিরে গিয়ে থাকে, বিনাটিকিটের যাত্রী হয়ে।

ডাক্তার তালুকদারের আদর-আতিথ্য যতই জোরালো হোক, পরিবেশটা যে অস্বস্তিকর তাতে তো ভুল নেই। শুধু অস্বস্তিকরই নয়। ভয়াবহ-মতোও। কিন্তু জগবন্ধুকে না বলে পালানো? কী জানি, হয়তো ভেবেছিল আমি যেতে বাধা দেব। অথচ আমাকে সত্যি বলতে পারে না, আমাদের নিয়ে আজই ফিরে চলুন।

হোটেল বিউটিতে ফিরে যেতে পারত!

তাই বা কী করে হবে? টাকাপয়সা সঙ্গে আছে?

আরও একবার মনটা দুঃখে ভরে গেল জগবন্ধু বোসের, ওদের হাতে টাকা দিয়ে রাখেননি বলে।

মনের অবস্থা দারুণ খারাপ জগবন্ধুর। জলজ্যান্ত দুটো ছেলে হারিয়ে গেল অথচ পুলিশকে জানাতে পারছেন না। যাচ্ছিলেন একদিন মরিয়া হয়ে, নিবৃত্ত করলেন নস্করবাবু। বললেন, ভেবেচিন্তে কাজ করুন মশাই! গেলেই তো জিজ্ঞেস করবে, কে হারিয়েছে আপনার? কী বলবেন? বিউটি হোটেলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে পার পাওয়া যায় মশাই, পুলিশের কাছে যায় না। তারপর, এদিকে যাদের হারিয়ে আপনি পাগলা হয়ে পড়েছেন, তাদের নাম জিজ্ঞেস করলে তো আপনাকে নোটবুক খুলতে হবে। নাম, বয়েস, বাপ-ঠাকুর্দার কুলুজি ঠিকুজি সব নিয়ে যখন জেরা করতে শুরু করবে? তখন? জানেন সে-সব? শেষ অবধি এই হবে, আপনাকেই সন্দেহ-জনক ব্যক্তি বলে অ্যারেস্ট করে বসবে।

এসব শোনার পর আর ও-পথ মাড়াতে সাহস হয়নি জগবন্ধুর।

তবে আর কতদিন একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করবেন? সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করলেন। এখনো আশা, যদি বিনাটিকিটের যাত্রীর সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে যায়।

আহা! তারা যে তখন কোথায় যদি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন প্রফেসর বোস।

॥ দশ ॥

তালুকদারকে ওইভাবে দেওয়াল ফাঁক করে উঠে আসতে দেখে, কী করে যে দাঁড়িয়ে থাকল ট্যাঁপা-মদনা, তা ভগবানই জানেন। একে তো গতরাত্রে খাদ্যের সঙ্গে কী না কী খাইয়ে দিয়েছিল জীবনরাম, যার জন্যে এখনো মাথা ঘুরছে, তারপর আবার এই দৃশ্য। মাথা তো লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরতে লেগে গেল। তবু মদনা ট্যাঁপাকে সবেগে আকর্ষণ করে কাচের দরজার চওড়া কাঠের আড়ালে টেনে নিয়ে চিড়ের মতো চেপটে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল। তবে পর্দাটা ঈষৎ সরানোই থাকল। আর তখন বুঝতে পারল, ওই কাচের ঘরের দেওয়ালটা সম্পূর্ণ কাঠের হালকা নীল রঙ দেওয়া, তাই ইটের দেওয়াল বলে মনে হচ্ছিল। কাঠের দেওয়াল সরতেই আলমারির ঠেলা দরজার মতো।

কথা কওয়া চলবে না, মদনা মনে-মনেই বলল, এখন বুঝছি, সিঁড়ির সাধারণ দরজার তালাটায় মরচে পড়া কেন। ওখান দিয়ে ওঠেই না কেউ।

তালুকদার উঠে এসে বিছানায় শোওয়া লোকটার বুকে চোঙ বসিয়ে দেখলেন, নাড়িটা দেখলেন, তারপর একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বসলেন। ডাকলেন, করালী!

একটা লোক সেই সিঁড়ি দিয়েই উঠে এল।

করালী নামটা একটু আগেই শুনেছে এরা। তার মুখেই শুনেছে। শুধু মরে পড়ে থাকার দরুন চোখে দেখা হয়নি। দেখল। রোগা, কালো, দাঁত উঁচু।

তালুকদার বললেন, ছোঁড়া দুটো কী করছে?

করালী বলল, ঘুমোচ্ছে স্যার।

কষ্টে হাসি চাপল ছোঁড়া দুটো।

তালুকদার ভুরু কুঁচকোলেন, এখনো ?

আজ্ঞে, তাই তো দেখছি।

ডেকে দাওনি কেন ?

আজ্ঞে ডেকেছিলাম।

ডেকেছিলে ? তবু উঠল না ? মামদোবাজি নাকি ? টেঁসে যায়নি তো ?

করালী জিভ কাটল।

তা এ লোকটার ব্যবস্থা হোক।

আজ্ঞে আপনি যা বলবেন।

বলছি—পুরো সেন্সলেস হয়েছে মনে হচ্ছে ?

আজ্ঞে গোঙানিটা তো থেমেছে।

তা থামুক। তবু টেপটা চালিয়ে যাও। দ্যাখো সাড় আসে কিনা।

করালী সেই দেওয়ালটা টেনে বন্ধ করে দিল, তারপর এধারের একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করল একটা বাক্স মতো, কোথায় কী সুইচ টিপল। বেজে উঠল একটা জগঝম্প বাজনা। উঃ কী জোর আওয়াজ !

ট্যাঁপা চোখের ইশারায় প্রশ্ন করল—রেডিও ?

মদনা সেইভাবেই বলল—সেই রকমই।

বাজনাটা বাজছে বাজছে, হঠাৎ এ কী ব্যাপার ! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এদের। বাজনা বন্ধ হওয়া মাত্রই কথা বলছে কারা ? কাদের গলা ? কী বলছে এসব ? বলছে—

লোকটার সবই কেমন রহস্য-রহস্য, না রে মদনা ? মামাবাবুকে সাট্রে-পাট্রে ধরে এখেনে নিয়ে আসা ; ছাতের নামে হাঁ-হাঁ করে ওঠা—যা বলিছিস ট্যাঁপা, খুব সন্দ হচ্ছে। মামাবাবুকে বলে চলে যাই চল। হোটেল বিউটি ঢের ভাল।

বন্ধ করে দিল যন্ত্রটা। ট্যাঁপা সেইখানেই দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল। তার দারুণ মাথা ঘুরছে।

মদনা চোখ ঠিকরে দেখতে লাগল, করালী রেকর্ডারটা রেখে দিয়ে আর-একটা ড্রয়ার থেকে বার করল একটা কাচের ট্রে। তাতে সাজিয়ে আনল তুলো ব্যাণ্ডেজ, ইনজেকশনের ছুঁচ, ওষুধপত্রের শিশি।

ডাক্তার তালুকদার চেয়ারটা টেনে নিয়ে রুগীর মাথার কাছে বসলেন, তারপর লম্বা সিরিঞ্জটা তার মাথার মাঝখানে বিঁধিয়ে দিলেন।

মদনের মনে হল ছুঁচটা বুঝি তারই ব্রহ্মতালুতে বিঁধে গেছে। মদনা কি চেঁচিয়ে উঠবে? ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবে? না কি দরজার কাচ ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই তালুকদারের ওপর?

বোকা মুখ্যু হলে কী হবে, ছেলে দুটো বুঝতে পারছে, এটা রোগীর চিকিৎসা নয়, অন্য ভয়ানক কিছু ব্যাপার! সেই ব্যাপারটাই দেখতে থাকে চোখ ঠিকরে-ঠিকরে।

সিরিঞ্জটা বার করলেন তালুকদার, মুখটায় তুলো চেপে উঁচু করে তুলে ধরে কী যেন দেখলেন, রক্তাক্ত কিছু একটা বস্তুতে ভর্তি হয়ে গেছে সেটা। আস্তে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সিরিঞ্জটাকে একটা খাপের ভিতর তুলে ফেললেন। তারপর বললেন, করালী, খানিক পরে ওষুধটা খাইয়ে দিস।

করালী বলল, তা তো দেব। জ্ঞান ফিরলেই তো বিটকেল চেঁচাবে।

চেঁচাক না। বুনো শেয়াল-কুকুরাও বিটকেল চেঁচায়

ছোঁড়া দুটো কাছেপিঠে রয়েছে।

থাক না, আজই তো ওদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে।

করালী কর্তার অলক্ষ্যে একবার দুটো হাত ওলটাল।

মনে হল করালী যেন আশাছাড়া! কিন্তু ওইটা কী বলল? কী চালানো হবে তাদের ওপর?

ট্যাঁপাকে ঠেলে সাড় ফিরিয়ে আবার নিঃশব্দে ফিরে এল মদনা। আবার সেইভাবে শুয়ে রইল। নির্ঘাত এক্ষুনিই আসবে করালী, তারা বেঁচে আছে কিনা দেখতে।

ট্যাঁপা আস্তে বলল, আমরা কি আবার তেমনি মরণঘুমের পার্ট প্লে করব রে মদনা?

নাঃ! আড়া-মেড়া ভাঙবি। আর পারা যাচ্ছে না।

একটু পরে সত্যি-সত্যিই করালী এল। মনে হল ওই কাচের দরজাটা খুলেই চলে এসেছে।

ট্যাঁপা একটু চোখ চিরে দেখল করালীর হাতে একটা মোমবাতি, আর একটা দেশলাই। ফট করে মোমবাতিটা জ্বালল, পকেট থেকে মস্ত বড় একটা শুকনো লঙ্কা বার করে লঙ্কার আগাটা একটু পোড়াল, তারপর সেটা মদনার নাকের সামনে ধরে বলে উঠল, এই ছুঁচো, ঘুমোচ্ছিস, না সাবাড় হয়ে গেছিস?

লঙ্কাপোড়ার তীব্র ধোঁয়া-গন্ধ নাকে যেতেই মদনা জেগে উঠে, রেগে উঠে, তড়াক করে উঠে বসে বলল, আঃ! কী হচ্ছে? কাঁচা ঘুমটা ভাঙাচ্ছ কেন?

করালী বিশ্রী গলায় হেসে উঠে বলল, কাঁচা ঘুম? আমার চাঁদু রে! একটু হলেই তো পাকাঘুমের পানসি চড়ে চড়ে বৈতরণী পার পার হয়ে যাচ্ছিলি। ওঠ! ওঠ ব্যাটা ধেড়ে ইঁদুর।

মদনা উঠে বসে হাই তুলছে। বলল, শুধু-শুধু মুখ খারাপ করছ কেন?

ওহো-হো! করালী একপাক নেচে নিয়ে বলে, তবে কি মুখে রাজভোগ ঠুসে বসে হরেকেষ্ট আওড়াব? যা ব্যাটা যা—এখানে বাথরুম আছে, চান করে নে। তারপর পেটপুরে খেতে পাবি। তারপর—তারপর? হ্যা হ্যা হ্যা! করালী ঠিক খ্যাঁকশিয়ালের মতো বীভৎস হাসি হেসে ওঠে। তারপর বলে, প্রেথম কাকে লাশে চড়াব বল? তোকে? না ওই নাটের গুরুটিকে? তা কী হতে চাস বল! বোবা? কালা? হ্যালাখ্যাপা? না কি পুরো খ্যাপা? কোন্‌টা পছন্দ? খোঁড়া বাদে যা হতে চাস, হয়ে যেতে পারবি।

মদনা ভাবল, মরণ তো নির্ঘাত। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছেই, তবে আবার নরম হতে যাব কোন্ দুঃখে? কড়া গলায় বলে উঠল, কেন, এসব হতে যাব কেন? ইচ্ছে হয় তুমি হওগে না। তোমারই বোবা হওয়া উচিত। যা বাক্যি।

কী ? কী বললি ? আমার বাক্যি খারাপ ?

না তো কি চিনিপাতা দই ?

দ্যাখ ! এক্ষুনি শেষ করে দিতে পারি, তা জানিস ?

মদনা একটা হাই তুলে বলল, জানি।

ওঃ। বটে, তবে চল এখুনি তোর দফা গয়া করিগে. আর পেট পুরে খেতে হবে না।

থাকে ফাঁড়া খণ্ডে যাক। মদনা বলে উঠল, তোমার ইচ্ছেয় তো হবে না। কর্তার ইচ্ছেয় কর্মো। না খেলে হবেই না।

করালী হঠাৎ চমকে উঠল, থমকে বলল, এসব কথা কী করে জানলি তুই ?

মদনা অবশ্য আনতাবড়িই বলেছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারল, তাদের ওপর যে একটা কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, সেটা খাওয়া-দাওয়ার পরে করাই নিয়ম। তার মানে তালুকদারের ব্যবস্থাতেই হবে।

এসব বুঝে ফেলে মদনা গম্ভীরভাবে বলল, হাত গুনে জেনেছি।

হাত গুনে ? ফোঃ !

কেন ? ফোঃ করার কী আছে ? কোনো মানুষ হাত গুনতে পারে না ? তোমার নাম করালী নয় ? কর্তার যত দুষ্কর্মের সাহায্যকারী নও তুমি ? কী না পাপ করে চলেছ তেনার সঙ্গে !

খবরদার ! একটা কথা বলবি না, শয়তানের ছা না ! কে বলেছে তোকে এসব ? ওই ড্রাইভার ব্যাটা বুঝি ?

বাঃ। বাঃ ! সে তো বোবা !

সময়বিশেষে না-বোবা ! ওই ব্যাটাই বলেছে নির্ঘাত ! ওকে আমার সন্দেহ হয়। ইশারায় সব বোঝায় ; কথার অধিক।

ওর কোনো দোষ নেই। বললাম তো হাত গুনতে জানি। কর্তা কী করে, তাও আমার জানা।

তো কখন দেখলি হাত ?

হাত দেখতে হয় না। মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। পাপকাজ

করতে-করতে তোমার মনে ঘাটা পড়ে গেছে—

চুপ চুপ! একদম চুপ! ব্যাটা শয়তান! চল, আগেই তোর ওপর ওষুধ ঝাড়াচ্ছি। রাগে গনগন করতে-করতে চলে গেল করালী।

ট্যাঁপা বলল, তোর প্রাণে কি ভয়-ডর নাই মদনা? ওই লোকটাকে স্বেচ্ছায় চটাচ্ছিস?

মদনা বলল, মরার বাড়া ভয় নেই।

গনগন করতে-করতে চলে এসে করালী তালুকদারের কাছে এল; ওদিকে জীবনরাম তখন পাগলদের ভাত খাওয়াচ্ছে।

তালুকদার উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ঘুম ভেঙেছে শয়তান ছুটোর?

ভেঙেছে। কিন্তু—

কী কিন্তু? খুব কান্নাকাটি করছে?

কান্নাকাটি? করালী বলে, ওদের চিনতে আপনার বাকি আছে স্যার। সবটা যদি শোনেন—। বলে নিচু গলায় সবটা শোনাল করালী।

তালুকদারের মুখটা রাগে তামাটে হয়ে গেল। বললেন, ফালতু ছুটো বেওয়ারিশ ছেলে পাওয়া যাবে আশায় হতচ্ছাড়া প্রফেসরটাকে অত তোয়াজ করে নিয়ে এলাম!

ওটাই ভুল হয়ে গেছে।

হুঁ। খুব যে জ্ঞান দিচ্ছিস। এক্সপেরিমেন্ট চালাবার লোক যোগাড় করতে পারছিস? লোকের অভাবে কাজ এগোচ্ছে না। সে-ব্যাটা হোটেলে বসে থেকে মাস-মাস পয়সা খাচ্ছে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। বেশি জ্ঞান দিতে আসবি তো তোকেই বেছে নেব!

তা নিন-না কর্তা, করালী একটা মোচড় খেয়ে বলে, করালী হতভাগা তো তাহলে বেঁচে যায়।

কেন? কেন? কী এমন মরে আছ?

মরার অধিকই! চব্বিশ ঘণ্টা পাপ-কম্মো—

থাম! আর ধর্মজ্ঞান দেখাতে আসিসনি। যা, চটপট ছোঁড়া দুটোকে খাইয়ে নিগে যা। আর সব রেডি আছে তো?

আজ্ঞে সে আর বলতে। ওই লম্বাটাকে একটা মোক্ষম দাওয়াই দিন।

ছাদেরই কোনো একটা কোণে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে চর্ব্যচোষ্য খেয়ে মদন বলে উঠল, ইঞ্জেকশানটা দেবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিই না করালীবাবু!

ইঞ্জেকশান! করালী বিদ্যুতের শক্ খাওয়ার মতো ছিটকে উঠে বলল, ইঞ্জেকশান মানে?

মানে তো তুমিই জানো দাদা!

চুপ! থাম বদমাশ কে তোকে সাপ্লাই করছে এসব খবর?

বললাম তো হাত গুনতে জানি। এখন আমাদের কাঁচের ঘরে নিয়ে যাবে, ইলেকট্রিকের শক মেরে মেরে অজ্ঞান করবে, তারপর দেওয়াল ফাঁক করে কর্তা এসে ঢুকে—

আঁা? কী বললি? ওরে বাবা! এ কে রে বাবা! দেব্‌তা, না অপোদেব্‌তা—। বলতে বলতে ছুটে চলে গেল করালী।

ট্যাপা হতভম্ব হয়ে বলল, এসব কথা বললি তুই?

বলব না কেন? ভয় খেয়ে গেছে। বোধহয় ডাক্তারকে বলতে গেল, এই বেলা বিনা পাহারা। চল তো দেখি।

জানলা দিয়ে দেখল, এই দিকটাই বাড়ির পিছন। এখান থেকেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে তালুকদারের চিড়িয়াখানার চুড়োটা দেখা যাচ্ছে।

নাঃ! লাফঝাঁপ দিয়ে পালাবার কোনো উপায় নেই। ঘরের মধ্যে কী আছে? ঘরটা তো রান্নাঘরের মতো। বঁটি ছুরি কাটারি কিছু আছে নাকি?···নেই! শুধু একটা জনতা স্টোভ! আর দু-একটা বাসন।

মদনা আর কিছু করার না পেয়ে স্টোভটাই তুলে ঝাঁকাতে লাগল।



আঃ মদনা, কী হচ্ছে ? এই কি তোর খেলার সোমায় ?

মরণকালে একটু খেলেই নিই। এই, এই তাকের ওপর ওই বোতলটা কিসের রে ? কেরোসিনের ? বাঃ বাঃ। একটা দেশলাইও মজুত। জুত করে একটু চা খেলে কেমন হয় রে ট্যাপা ?

আমি জানি না, তোর যা খুশি কর। বলে ট্যাপা হাল ছেড়ে দেয়।

মদনা তাই করে। যা খুশি !

করালীর কথাকে নস্যাৎ করে তালুকদার বলেন, হাতই গুন্নুক আর পা-ই গুন্নুক, আর দু ঘণ্টা পরেই তো মগজ ধোলাই হয়ে যাবে। তারপর—। বলে একটু হাসলেন, তারপর ডাক্তার তালুকদারের বাগানে, একটা ন্যালাখ্যাপা মালি ঘাস ছাঁটবে, জল ছিটোবে।

আর বেঁটেটা।

তালুকদার অবহেলার গলায় বললেন, মেমারি খতম করে ফেলে নিরেট করে দিলেই হবে। জীবনরামটার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। ঠিক আছে, ঘণ্টা দুই রেস্ট নিয়ে নিই, বেজায় টায়ার্ড লাগছে। ঠিক বেলা দুটোর সময় রেডি হবি।

কিন্তু বেলা দুটো পর্যন্ত কি রেস্ট জুটেছিল ডাক্তার তালুকদারের ভাগ্যে ?

কী করে জুটবে ? বাড়িতে আগুন লাগলে কি কেউ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারে ? বেলা একটা বাজার আগেই তো আগুন আগুন শব্দে তোলপাড় হয়ে উঠল তালুকদারের জটিল নকশায় গাঁথা বাড়িটা। কোনো একখান থেকে জীবনরাম চেঁচাচ্ছে, আগুন আগুন, কোনোখান থেকে করালী চেঁচিয়ে উঠেছে, আগুন আগুন, পাগলের ব্যারাক থেকে পাগলারা চিৎকার করছে, পুড়িয়ে মারল, পুড়িয়ে মারল !

এর সঙ্গে গাঁক-গাঁক চেঁচানি। আর ওই গাঁক-গাঁকানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানার বন্য জন্তুর দল। আগুন তাদের ধারে-

কাছে না পৌঁছলেও ধোঁয়া এবং আলো দেখেই ওরা ভীত ত্রস্ত!

আশ্বিনের শুকনো গাছপালা, আর ঠিক দুপুরের রোদ! আগুন ছড়াতে কতক্ষণ?

তালুকদার যখন অবস্থাটা সম্যক অনুভব করে ছুটে ছাদের ঘরে ওঠবার কাঠের সিঁড়ির লুকনো দরজাটার তালা খুললেন, সামনেই উপর থেকে ভেঙে পড়ল জ্বলন্ত আগুনের চাপড়া। পড়েই হাউহাউ করে জ্বলে উঠল, আর এটাই ক্ষণে-ক্ষণে জোগান দিয়ে চলল সেই নড়নশীল দেওয়ালটা। কাঠের দেওয়াল জ্বলে জ্বলে পড়ছে কাঠের সিঁড়ির ওপর।....

ওঃ! ওইখানেই যে ডাক্তার তালুকদারের যথাসর্বস্ব! আগুন ভেদ করেও উঠে যেতে হবে।

।। এগারো ।।

কে এই লোক? ভারতীয় না অভারতীয়?

জিজ্ঞেস করলে হেসে বলে, মঙ্গলগ্রহের প্রাণী। নাম জানতে চাইলে বলে, ভবঘুরে।

একটি বিশিষ্ট খবরের কাগজের বিশেষ একটি কলামে বেরোল খবরটা, স্মার্ট পোশাক, স্মার্ট চেহারা, অনর্গল ইংরিজি বলে, হিন্দিতেও হারে না, এই অজ্ঞাতপরিচয় লোকটিকে নাকি দেশের সর্বত্র দেখা যায়। এ-বেলা দেখা গেল কলকাতায় তো ও-বেলা গোয়ায়, এখন বোম্বাই তো তখন মাদ্রাজ, আজ ওড়িশা তো কাল মেঘালয়। ওঠেন দামি দামি হোটেলে। কেউ কেউ বলছে আগে নাকি বর্মামুলুকে ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তবে আপাতত তিনি কলকাতা পুলিশের হেফাজতে লালবাজারে। একটা বেআইনি জুয়ার আড্ডা থেকে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়েছেন। পুলিশের বুদ্ধি বিভাগ এঁর পরিচয় সম্পর্কে তল্লাশ করছে।

হঠাৎ হঠাৎ আচমকা এ-রকম এক-একটা রহস্যগন্ধী খবর পরিবেশন করাই এই ফীচারের উদ্দেশ্য। শেষ অবধি যে কী হল, তা আর বলে না। কেই-বা মনে রেখে শুনতে চায়? কিন্তু প্রফেসর জগবন্ধু বোসের এখন ভবঘুরে শুনলেই ঔৎসুক্য! লোকটা অনর্গল ইংরিজি বলে শুনেও ওঁর মনে হতে থাকে তল্লাশে কী জানা যাবে? লালবাজারে গিয়ে খোঁজ করবেন? জানতে চাইবেন, লোকটার পরিচয় পাওয়া গেল কি না? গেলেন না অবশ্য। আর এ-ঝোঁকটা মুহূর্তে উপে গেল, একটি শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের খবরে। খবরটা বেহারের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত।

পড়ে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল জগবন্ধুর, মাথার চুল উড়ে পালাতে চাইল। কাগজ রেখে বললেন, সাধন, আমি আজই আবার একবার বেরোচ্ছি, কবে আসব বলতে পারছি না।

যাচ্ছ কোথায়?

ফিরে এসে বলব।

টিকিট হয়েছে?

হয়ে যাবে। প্লেনে যাব।

মাথায় আবার ভূত চাপল?

জগবন্ধু সে-কথার উত্তর দিলেন না, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাঁচিগামী প্লেনের টিকিট যোগাড় করতে। অসম্ভব অস্থিরতা! হবে না?

রাঁচির পাগলা গারদের নিকটবর্তী একটি বিরাট বাগান সম্বলিত বাড়িতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার খবরে কী করে স্থির থাকবেন জগবন্ধু? আর কী করেই বা শান্ত থাকবেন, তার সঙ্গে যদি পড়েন ডাক্তার তালুকদার নামে এক মিথ্যাপরিচয়ধারী ব্যক্তি ওই গৃহে বাস করিতেন।

মিথ্যা পরিচয়? মিথ্যা পরিচয় মানে? ওই তো দীনেশ তালুকদার—জগবন্ধুর একদার সহপাঠী? তবে? তাছাড়া অতবড় একটা প্রতিষ্ঠানে বারো-চোদ্দ বছর কাজ করে আসছে লোকটা!

হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকেন জগবন্ধু।

হ্যাঁ! বারো-চোদ্দ বছর ধরে লোকটা শত শত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে বসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে—বললেন কলকাতা পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অফিসার শরদিন্দু রায়। কাজ মানে অকাজ, কুকাজ, জঘন্য কাজ! ভাবতে পারেন মশাই, লোকটা নিজের দাদাকে খুন করে····

খুন করে কক্ষনো নয়, দু-হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালে পট্টি মারা দীনেশ তালুকদার রেগে বলে ওঠে, দাদা রেলগাড়িতে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিছল। উন্মাদ রোগীদের সম্পর্কে স্পেশালিস্ট হয়ে, এখান থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়ে চলে আসছিল, আমি সঙ্গে ছিলাম। একটা কুপেতে টিকিট পাওয়া গিয়েছিল। গল্প করতে-করতে আসছিল, হঠাৎ রাত দুটোর সময় বলল, জল খাব, ব্যস!

শরদিন্দু রায় ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলেন, ব্যস! অমনি আপনি লক্ষ্মণভ্রাতা, সদ্যমৃত দাদার ডেড বডিটা ছুটন্ত রেলগাড়ির দরজা খুলে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে রাতারাতি ডাক্তার তালুকদার বনে গিয়ে, তাঁর কাগজপত্র-টত্র সব বাগিয়ে নিয়ে এসে চাকরিতে জয়েন করলেন। কেমন? অতঃপর একটা অজ্ঞাতকুলশীল শয়তানের সঙ্গে যোগসাজস ঘটিয়ে ফেলে, তার বিরাট পাপচক্রের জালে জড়িয়ে পড়ে, নিজেও একটি পাক্কা শয়তান হয়ে উঠলেন।

কথা হচ্ছিল তালুকদারেরই ড্রইংরুমে বসে। বাড়ির এদিকটা তেমন পোড়েনি, পুড়েছে রান্নাঘরের দিক, সিঁড়ি, সিঁড়ির তলা, আর ছাতের সেই রহস্যকেন্দ্র ঘরটা।

ঘর ভর্তি লোক। সোফা-সেটিতে কুলোয়নি, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যেমন পাগলা গারদের মেট্রন হরমুখ সিং, দারোয়ান রাজেন্দর, আর করালী, জীবনরাম তো থাকবেই দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে ট্যাঁপা-মদনাও। বসে আছেন হাসপাতালের আর এক ডাক্তার বিশ্বনাথ চট্টরাজ, জগবন্ধু, আর তালুকদার তো আছেনই। এবং রয়েছেন শরদিন্দু রায়। যিনি বাঘা অফিসার হলেও দিব্যি সরস।

তালুকদারের তো দু' হাতে ব্যাণ্ডেজ, কপালে পট্টি, ভুরু দুটো আর সামনের চুলগুলো ঝলসে পুড়ে যাওয়া, বীভৎস দেখাচ্ছে। করালীরও হাতের আগায় ব্যাণ্ডেজ, জীবনরামের গালে কপালে কয়েকটা ফোসকা। তালুকদারের মুখের চেহারা এমন বিভীষণ হয়ে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে সুযোগ পায় তো ওই শরদিন্দু রায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে তাকে চিরে ফেঁড়ে ফালা-ফালা করে। কিন্তু অবস্থা বড়ই বেপোট। চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে তালুকদারকে। আর বাকি অপরাধীদের জন্যে রয়েছে দু-দুটো আর্মড পুলিশ, যারা বন্দুকের নল উঁচিয়েই আছে। অপরাধী তো অনেকেই, করালী জীবনরাম ছাড়াও, ওই মেট্রন, ওই দারোয়ান—সকলেই অভিযুক্ত।

শরদিন্দু বললেন, হ্যাঁ, শুনুন আপনারা। এই মহাত্মা, শুধু ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ডাক্তার হয়েই ক্ষান্ত হননি। এই সুযোগে মার্ভেলাস একখানি ব্যবসা ফাঁদলেন। পার্টনার হলেন আর এক মহা-মহাত্মার। সেই লোকটাকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। কিছুতেই ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছিল না। আকাশগাড়ি চড়ে তিনি পৃথিবীটাকে চষে বেড়ান। এই এক্ষুনি এখানে আছে তো তক্ষুনি হয়তো নাগাল্যাণ্ডে, সকালে দিল্লি আছে তো রাত্রে কুলুভ্যালি। নাম জানতে চাইলে বলে ভবঘুরে, আর নিজেকে পরিচয় দেয়, মঙ্গলগ্রহের প্রাণী বলে। জানি না মঙ্গলগ্রহের সঙ্গেও তার আমদানি রপ্তানির ব্যবসা আছে কিনা, তবে এই পৃথিবীগ্রহের সর্বত্রই যে তার এই ব্যবসার জাল পাতা তাতে সন্দেহ নেই। আর সবই হচ্ছে ব্ল্যাক-বিজনেস। কালো বিজনেস, কালো টাকা। ইনি আবার নিজেকে সায়েন্টিস্ট বলেও পরিচয় দিয়ে থাকেন। অতি সাধারণ নতুন আঁকা ছবি, নতুন গড়া মূর্তি-টুর্তিকে ওঁর ল্যাবরেটারিতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের হাজার-হাজার বছরের পুরনো করে ফেলে বিদেশে বেচতে যান ভীষণ-ভীষণ চড়া দামে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তার পুরনো শিল্পনিদর্শন কিনতে পাগল, তারা হয় ওই মহাত্মার শিকার। কিন্তু এ-সব কাজকর্ম তো তবু পদে আছে। শুনবেন আরো? ডাক্তারী

শিখতে মানুষের কঙ্কাল লাগে, জানেন তো? ইতি সেই জিনিস রপ্তানি করতে, জ্যান্ত মানুষ মেরে কঙ্কাল সাপ্লাই করতে দ্বিধা করেন না। হাড়ের গুঁড়ো সাপ্লাই করতে গ্রামে গঞ্জে লোক লাগিয়ে রেখেছেন গো-বংশ ধ্বংস করতে। যাক, তাঁর কীর্তির কথা বলে ফুরোবে না। সম্প্রতি সেই মহা-বৈজ্ঞানিক এক ওষুধ আবিষ্কার করছেন, ওষুধ বা বিষ, যার প্রয়োগে সহজ সুস্থ মানুষকে পাগল করে ফেলা যাবে, বোবা কালা অন্ধ সব-কিছু। যুদ্ধবন্দীদের ওপর এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটাতে পারলে বা শত্রুপক্ষের কোনো শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পরমাণু বোমা না মেরেও তাদের অকেজো করে ফেলা যাবে, এই হচ্ছে মতলব। তা এই সিরামটি তৈরি হচ্ছে কিসের থেকে জানেন? উন্মাদ পাগল রোগীদের ব্রেন থেকে। হ্যাঁ, এই একটি মহান আবিষ্কার করছেন সেই মহাত্মা।

এই সময় ঘরের মধ্যে ভয়ানক একটা চাঞ্চল্য ঘটে। একসঙ্গে সকলেই কিছু বলতে চেষ্টা করে। শরদিন্দু রায় সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, থামুন, আমার কাহিনী এখনো শেষ হয়নি।

জিনিসটা তো চাই, কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়? নিয়মিত সাপ্লাই দিতে হবে তো? একসঙ্গে অনেক পাগল একমাত্র মেণ্টাল্ হসপিটালেই পাওয়া সম্ভব। তবে সেইখানেই জাল বিস্তার করো, ঘাঁটি গড়ো। তাই গড়ে ফেললেন তিনি, আর সহযোগী পেলেন, এই অতি ভদ্র, অতি অমায়িক, অতি সজ্জন ডাক্তার, ডাক্তার তালুকদারকে। আসলে যার কোনো ডিপ্লোমাই নেই। বছর-দুই মেডিকাল কলেজে পড়েছিলেন শখ করে। কিংবা দাদাকে টেক্কা দিতে। পেরে ওঠেননি। দাদা দেবেশ তালুকদার ভাল ভাবে পাস করে বেরোলেন, আর ইনি বাড়ি বসে তাস খেলে আড্ডা দিয়ে কাটাতে লাগলেন। তার পরের কথা তো আগেই শুনেছেন। ডাক্তার-দাদা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পেয়ে রাঁচি আসছিলেন, ইতি তাঁকে নিহত করেন—

তালুকদারের হাতই বাঁধা, মুখ তো বাঁধা নেই, তাই গর্জন করে

ওঠেন, ড্যাম লায়ার! আবার মিথ্যে কথা! বলেছি না হার্টফেল—

শরদিন্দু রায় হেসে বলেন, মরা মানেই তো হার্টফেল। গলাটা টিপে ধরলেও—তা সে যাক! রতনে রতন চেনে। কেমন করেই যেন চেনা হল সাজা-ডাক্তার মিস্টার তালুকদারের সঙ্গে, সেই মঙ্গল-গ্রহের প্রাণীটির। তিনি প্রমিস করলেন অগাধ টাকা সাপ্লাই করবেন, আর ইনি কথা দিলেন, প্রচুর মাল সাপ্লাই করবেন। সেই মালটি আর কিছু নয়, শুনলেন তো—পাগলের ব্রেন। ব্যাস, চলল কর্মকাণ্ড! ইনি হিতৈষী আর মহানুভব চিকিৎসক সেজে নিজের বাড়িতে স্পেশাল কেয়ারে রাখতে গারদ থেকে রোগী নিয়ে এসে, খুললেন একটি সংগ্রহ-শালা। যন্ত্রপাতি সব সাপ্লাই করছেন সেই মঙ্গলগ্রহের প্রাণী। কিন্তু তিনি তো আর সরাসরি দেখা দেবেন না, মাধ্যম হলেন রাঁচির মোরাবাদী রোডের হোটেল বিউটির প্রোপ্রাইটার সাম্ মিস্টার নস্কর। চলতে থাকে কালেকশন। মাথার খুলিতে সিরিঞ্জ ঢোকানোর সময় রোগীদের সেন্সলেস করে নিলে নাকি ঠিক মালটি পাওয়া যায় না, নেওয়া দরকার উদ্দাম উন্মাদ অবস্থার সময়। কাজেই তাদের সেই ভীষণ যন্ত্রণার অমানুষিক চিৎকার পাছে আশপাশের লোকের সন্দেহ সৃষ্টি করে, তাই জঙ্গুলে বাগানের মধ্যে বানানো হল একটি বন্য জন্তুর চিড়িয়াখানা। মানুষের আর্তনাদগুলো তাদের বলে চালানো যাবে। দেখুন, কী নিখুঁত ব্যবস্থা! এদিকে এই মাননীয় তালুকদার মশায়ের পার্টনার এঁকে নির্দেশ দিলেন, এই সিরাম থেকে মানুষের শরীরে কী কী অনিষ্ট ঘটানো যায়, তার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে। কিন্তু সেই মানুষটা কোথায় মিলবে? হোটেল বিউটির নস্করমশাই ভার নিলেন সে কাজের। একবার দিলেন ট্যাক্সি ড্রাইভার ইয়াকুব হোসেনকে, সে এখন বোবা হয়ে এই তালুকদারের গাড়ি চালাচ্ছে। একবার দিলেন, হোটেলের রাঁধুনি জীবনরামকে, সে এখন মেমারি হারিয়ে এঁর সেবা করছে। আর এই অতি পাজি লোক করালী কীভাবে এসে জুটে গেছে এই দুষ্কর্মের শাগরেদ হতে। তো ধর্মের কল তো একদিন বাতাসে নড়বেই? দৈবক্রমে একদিন তালুকদারের বাল্য-

সহপাঠী প্রফেসর জগবন্ধু বোস এলেন হোটেল বিউটিতে। সঙ্গে দুটি আশ্রিত ছেলে। ব্যাচেলার মানুষ, দয়াধর্ম দেখাতে পারেন। ব্যস, ওই ছেলে দুটির ওপর চোখ পড়ল নস্করবাবুর। সে সময় আবার তালুকদারও সেখানে। সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যান। জাল-বিস্তার, নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে ভরে ফেলা। আদর-যত্ন। এবং একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় তাদের ওপর ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করে, অসাড় করিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের পাপকেন্দ্র ওই ছাদের ঘরে বন্দী করে রাখা! ভেবেছিলেন, দুজনের ওপর দুটো এক্সপেরিমেন্ট করবেন, কিন্তু দৈবক্রমে ছেলেদুটি ভীষণ চালাক হওয়ায়, কেমন করে বুঝে ফেলায়, এই নৃশংস হৃদয়হীন লোকটা কিনা তাদেরকে ঘরে আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করল। ভাবুন, এই দুটি কিশোর ছেলে—এই যে সামনেই রয়েছে, এদের কিনা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টায়—

তালুকদার আবার গর্জন করে ওঠেন, কখনো না। বাজে কথা। আগুন এমনিই লেগেছিল—

তা হতে পারে। শরদিন্দু হেসে বলেন, বলেছি তো ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, সেই কলই বোধহয় আগুনটা লাগিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এই আগুনটা না লাগালে হয়তো আপনাকে ধরে ফেলা এতটা এগোত না। যেমন সেই মহাত্মা, সেদিন যদি জুয়ার আড্ডায় চেঁচামেচি করে লোক জড়ো না করতেন, তাহলে ধরা পড়তেন না। আরো দীর্ঘদিন তাঁদের এই মানবহিতকর আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে চলতেন। আমাদের জাল পাতা হল রাঘববোয়ালের জন্যে, ধরা পড়ে গেল এক পাপিষ্ঠ কুমির। তবে প্রফেসর বোস, আপনার এই পালিত ছেলে দুটি সেদিন হাসপাতালে গিয়ে খবর না দিলে—ও হ্যাঁ, এই যে দুটি মহাশয়, মিস্টার সিং আর মিস্টার চট্টরাজ, আপনারাও দয়া করে আমাদের গাড়িতে উঠুন এসে।

হাতকড়া পরিয়ে-পরিয়ে তোলা হল সকলকেই। বাদে জগবন্ধু আর ট্যাপা-মদনা।

।। বারো ।।

রেলগাড়িতে যেতে যেতে গল্প উঠল জমে।

অনেক কাটখড় পুড়িয়ে, অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অবশেষে প্রফেসর জগবন্ধু বোস তাঁর পালিত বালক দুটিকে নিয়ে কলকাতামুখী রেলগাড়িতে উঠে বসতে পেলেন। উঠে জমিয়ে গল্প।

ট্যাঁপা আর মদনার বিছানা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে শুনছেন জগবন্ধু বোস, মাথার চুল খাড়া করে। আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন, তারপর ?

তারপর ? তারপর উঁকি মেরে হাঁ হয়ে দেখলাম করালী সেই মাথায় ফ্রেম-আটা রুগীটাকে খাটসুদ্ধ গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে সেই দেওয়াল সরানো গহ্বরের নীচের সিঁড়িটা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে নিয়ে গেল।

উঃ! কত কলকৌশল করে রেখেছিল ! তারপর ?

তারপর আর আমাদের পায় কে। এস্টোভটা আর কেরোসিনের বোতল এনে ফেলে, এস্টোভের মুখটি খুলে সব তেলটা কাঠের দেয়ালে ছড়িয়ে দিয়ে, ম্যাচকাঠি ফস !

হ্যাঁ !

হ্যাঁ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তিন লাফে নেবে এসে বোতলের কেরোসিনটা ছুঁড়ে আগুনে ছড়িয়ে দিয়ে বোঁ-বোঁ ছুট।

জগবন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বলেন, কী সর্বনাশ। বলিস কী ! আগুন লাগিয়েছিলি তোরা !

উপায় কী জ্যাঠাবাবু, পালাতে তো হবে।

তারপর !

তারপর ছুটতে ছুটতে বাগান জঙ্গল চিড়িয়াখানা সব পার হয়ে অ্যাক্কেবারে গারদের আফিসে। বললাম, ডাক্তারবাবুর বাড়িতে

অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, শিগগির যা করবেন করুন গে।

তারপর? যেই না শুধিয়েছে তোমরা কে?—ত্যাখোন গড়-গড়িয়ে সব বলে দিলাম। ডাক্তারবাবুর কীর্তি প্রকাশ করে দিতে কিছু আর বলতে ছাড়িনি। শুনে না আমাদের আটকে ফেলল, পুলিশ ডাকল, জেরার চোটে মাথা জ্বালিয়ে দিল।

ওরে ব্বাস! ভয় করল না তোদের?

বীর বালকরা বুক ফুলিয়ে বলে উঠল, সত্যি কথা বলব, ভয়টা কী?

তারপর?

তারপর আমাদেরকে রাঁচি শহরে এনে ফেলে হোটেল বিউটির নস্করবাবুকে সাক্ষী মানল আমাদের চেনে কি না, এই সব র‍্যালা। তারপর তো হি-হি-হি, তারপর তো নস্করবাবু নিজেই কুপোকাত।

জগবন্ধু বলে ওঠেন, তোদের এখন মানিকজোড় না বলে জোড়মানিক বলা উচিত। তোদেব দ্বারাই তো এত বড় একটা গ্যাং ধরা পড়ল। পুলিশ বলেছে তোদের একটা পুরস্কার দেবে। কিন্তু আগুন যে তোরাই বুদ্ধি করে ধরিয়ে দিয়েছিলি, সেটা তখন বললি না কেন? তাহলে আরো বাহবা পেতিস। ওরা তো বলেছে আগুনটা ধরে যাওয়াতেই সুবিধে হয়ে গেল—

ট্যাঁপা বলল, বেশি বাহোবাতে কাজ নাই মামা, বললে ত্যাখোন হয়তো আবার, লোকের ঘরে আগুন দিলি ক্যানো? বলে অ্যারেস্টো করে বসত!

জগবন্ধু বললেন, তা বটে! বুদ্ধি ছাজ! তা ওরা দিক না-দিক, আমিই তোদেব কিছু একটা পুরস্কার দেব।

ট্যাঁপা বলে উঠল, অন্য পুরস্কারে কাজ নাই মামাবাবু, এই অমনিষ্যি দুটোকে যদি একটু মনিষ্যি করে দ্যান সেটাই পুরস্কার।

স্বভাব অনুযায়ী হা-হা করে হেসে ওঠেন জগবন্ধু। বলেন, সেটা তো আমার পুরস্কার হবে। নিজের বলতে দু-দুটো মনিষ্যি পেয়ে যাব। কিন্তু অমনিষ্যি তোদের বলছে কে?

আমরা নিজেরাই বলি মামাবাবু! ট্যাঁপার গলায় গভীর মনস্তাপের সুর।

ওরে বাবা! এ যে দিব্যি জ্ঞানের কথা।

মদনও পরিতাপের গলায় বলে, একটুকু জ্ঞান জন্মেছে বলেই তো টের পাচ্ছি জ্যাঠাবাবু, কত অ-জ্ঞানী ছিলাম আমরা। আমাদের জীবনের ইতিবেত্তান্ত যদি শোনেন!

জগবন্ধু হেসে উঠে বলেন, সেরেছে! একে জীবন, তায় আবার ইতিহাস কাহিনী! থামা দে বাবা! দারুণ ঘুম পাচ্ছে। যা ছোটা-ছুটি চলেছে ক'দিন।
